হালদার সাহেব

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫১
মূল্য দুই টাকা

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী

সুহৃদ্বরেষু—

'হালদার সাহেব' মূল নাটক নয়, 'শতাব্দীর অভিশাপের' নাট্যরূপ। এর পিছনে যে ইতিহাস আছে তা বলা প্রয়োজন।

১৩৪৮ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' পূজা সংখ্যায় 'শতাব্দীর অভিশাপ' সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয়। তার ক'দিন পরেই রাঁচিতে যে সাহিত্য সম্মেলন হয় তাতে সভাপতি ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণে বইখানির সপ্রশংস উল্লেখ করেন। নরেশ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য এখনও আমার হয়নি। তাঁর অযাচিত প্রশংসার জন্তে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এর কয়েক মাস পরেই একদিন অধুনা-লুপ্ত 'নাট্যনিকেতনে' কি একটি অভিনয় দেখতে গেছি। সেখানে 'নাট্যনিকেতনের' স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় আমার কাছে 'শতাব্দীর অভিশাপ'কে নাটকে রূপায়িত ক'রে মঞ্চস্থ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। বিষয়টিকে তখন আমি কোনো গুরুত্ব দিইনি। একে আমি 'সাধু অভিপ্রায়' হিসাবেই গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এর পর তাঁর কাছ থেকে যখন পুনঃ পুনঃ তাগিদ আসতে লাগলো তখন আমিও উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। এবং কিছুদিনের মধ্যেই নিজেই উপন্যাসখানিকে নাটকে রূপান্তরিত করলাম। নাটকে হস্তক্ষেপ এই আমার প্রথম এবং বোধ করি বা শেষ। কেন বলছি :

বইখানি মঞ্চস্থ করার আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দুর্ভাগ্য-বশতঃ 'নাট্যনিকেতন' উঠে গেল।

বাঙলা রঙ্গালয়ে একজন শ্রেষ্ঠ প্রযোজক হিসাবে প্রবোধদা'র খ্যাতি আছে। তাঁর সব চেয়ে বড় গুণ ছিল এই যে, বাঙলা সাহিত্য তিনি পড়তেন। কারও কোনো রচনায় ভালো নাটকের সম্ভাবনা দেখলে তিনি সে সম্বন্ধে উৎসাহ দিতেন। তাঁরই উৎসাহে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' নাটকে রূপান্তরিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়। বস্তুতঃ গোড়ায় প্রবোধদা'র উৎসাহ না পেলে তারাশঙ্কর যে কোনোদিন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে নাটক রচনায় মন দিতেন, এ আমি ভাবতেই পারি না।

আমার নিজের কথাই বলি। 'নাট্যনিকেতন' উঠে যাওয়ার পর বৃদ্ধ 'হালদার সাহেব' আমার দেরাজে আটক রইলেন। দিনের আলো দেখার হয়তো কোনোদিনই তাঁর সৌভাগ্য হ'ত না। আমার নিজের এ বিষয়ে কোনো উৎসাহ ছিল না। শুধু সাহিত্যিক-বন্ধু শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বিনয় দত্ত ও শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনের 'প্ররোচনায়' এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাসের উদ্যোগে এই দুষ্কর্ম সাধিত হয়েছে।

আমার মনে এই প্রশ্ন জেগেছিল যে, যে নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হ'ল না, তা ছাপবার সার্থকতা কি? এর উত্তর পেয়েছিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও লাইব্রেরিয়ান বন্ধুবর ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের কাছ থেকে। তিনি আমাকে বললেন, নাটকখানা ছেপে ফেলবার জন্যে। শুধু তাই নয়, আরও

বললেন কতকগুলো সত্যকার ভালো নাটক লিখতে, গতানুগতিক সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্যে নয়, সখের থিয়েটারের জন্যে। কারাগারে থাকতে নাট্যসাহিত্যের অভাব তিনি বিশেষ ভাবে অনুভব করেছিলেন।

কথাটা আমার মনে লাগে। যে কারণেই হোক, সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে রচিত নাটক সাহিত্য থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়েছে। রঙ্গালয়ের দৃশ্যপটের মতোই তা নিতান্ত স্থূল, তাতে সূক্ষ্ম কাজের অভাব আছে। তার বনিয়াদ কতকগুলি সুলভ ভাবালুতা এবং সস্তা প্যাঁচের উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে ক'রে 'নিম্ন শ্রেণীর' দর্শকদের কাছ থেকে করতালি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু রসিক দর্শকদের পীড়া দেওয়া হয়।

আমি বলছি না, সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত সকল নাটকই এই পর্যায়ের। ভালো নাটকও আছে যা সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। কিন্তু সম্ভবতঃ 'নিম্ন-শ্রেণীর' দর্শকদের তুষ্টিবিধানের জন্যে তারও সুর যে স্থানে স্থানে অশোভন ভাবে নামানো হয়েছে, যে-কোনো মনোযোগী পাঠকেরই তা দৃষ্টি এড়াবে না।

কেন এমন হয়? বাঙলা দেশে শক্তিমান নাট্যকারের অভাব নেই, সুদক্ষ নটের অভাব নেই, রসিক দর্শকের অভাব আছে এও মানতে পারি না। তবে এমন হয় কেন?

এ কেন'র উত্তর বাঙলার রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষেরা দেবেন।

অনেকেরই ধারণা এই যে, নাট্যকলার উন্নতি বিশেষভাবে সখের থিয়েটারগুলির উপরই নির্ভর করছে। তাঁদের ব্যবসায়

সাফল্যের দিকে চাইতে হয় না। নব-নব আঙ্গিকের সাহায্যে অভিনয়-কলাকে সমৃদ্ধ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। বাইরের চটকের অভাব তাঁরা অভিনয় নৈপুণ্যের দ্বারা পূরণ করেন। বস্তুতঃ সাধারণ রঙ্গালয়ের সমস্ত খ্যাতিমান নটই সখের থিয়েটার থেকে এসেছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, সখের থিয়েটারে এঁদের যে ঔজ্জ্বল্য দেখা গিয়েছিল, ব্যবসায়-সাফল্যের তাড়নায় এবং উচ্চাঙ্গের নাটকের অভাবে অনেকেরই তা ধীরে ধীরে মলিন হতে আরম্ভ করে।

'হালদার সাহেব' এই সমস্ত সখের থিয়েটারের জন্যেই প্রকাশিত হ'ল। সত্য কথা বলতে কি, বাঙলার বাইরে থেকে কয়েকজন সেখানকার সখের থিয়েটারে 'শতাব্দীর অভিশাপ'কে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করার জন্যে আমার কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। সে সময় তাঁদের অনুমতি দিতে আমি উৎসাহ বোধ করতে পারিনি। আজকে 'হালদার সাহেব' প্রকাশিত হওয়ার পরেও তাঁদের সতর্ক করার প্রয়োজন বোধ করছি।

আমি নাট্যকার নই, ঔপন্যাসিক। পূর্বেই বলেছি, নাট্যরূপ দেওয়ার প্রয়াস এই আমার প্রথম। 'শতাব্দীর অভিশাপ' যাঁদের ভালো লেগেছে, 'হালদার সাহেব'ও তাঁদের ভালো লাগবে এ আশা আমার আছে। কিন্তু পড়তে ভালো-লাগা এবং অভিনয়ে সাফল্য লাভ করা এক বস্তু নয়। আমার আশঙ্কা আছে, এই নাটকে এমন কিছু কিছু ত্রুটি থাকা সম্ভব, রিহার্স্যালে না দিলে যা ধরা পড়া এবং সংশোধন করা মুস্কিল। সখের থিয়েটারে অভিনয় করতে গিয়ে অনেকেই হয় তো সেরকম মুস্কিলে পড়বেন।

তাঁদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, মূল উপন্যাসখানির সঙ্গে মিলিয়ে তাঁদের নিজেদেরই সেটুকু ক'রে নিতে হবে। আমার বিশ্বাস, সংশোধনের পরিমাণ খুব বেশী হবে না। তাঁরা যদি এ সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান উপদেশ দয়া করে আমাকে জানান, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করব। নাটক ও সাহিত্যের মধ্যে সেতু-নির্মাণের যে প্রয়াস আমি করেছি, তাঁদের সহযোগিতায় তা সফল হ'লে আমার শ্রম সার্থক হবে।

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই নাটকে যে গানখানি প্রকাশিত হয়েছে তার রচয়িতা সুকবি শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সেন। এর জন্যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

পাত্র-পাত্রীগণ

	হালদার সাহেব
শৈলবিহারী	ঐ পুত্র
রামেন্দু	ঐ পৌত্র
গোপেন্দ্র সরকার	জনৈক অধ্যাপক
আলোক ঘোষ	ঐ
বড়ুয়া	ঐ
বিশ্বমোহন	বড়ুয়ার পুত্র
জ্ঞানেন্দ্র	ক্রিশ্চান যুবক

ছাত্রগণ, ডাক্তার, পুলিসগণ, রিক্সাওয়ালা ইত্যাদি

সুরুচি	শৈলবিহারীর স্ত্রী
কনক	ঐ কন্যা
মিসেস সরকার	গোপেন্দ্রের স্ত্রী
লিলি	ঐ কন্যা

[শৈলবিহারীর কক্ষ। সজ্জার দিক দিয়ে প্রায় নিরাভরণ বলা চলে। মেঝেয় একখানা কার্পেট পাতা। কয়েকটা তাকিয়া এখানে-সেখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে। মাঝখানে একটা অনুচ্চ ডেস্ক, একপাশে একটা ছোট বুক-কেস্। অন্য পাশে টিপয়। মধ্যেকার দরজায় একটা বিচিত্রিত খদ্দরের পুরু পরদা। বেলা তখন তিনটার বেশী নয়। সুরুচি দিবানিদ্রা থেকে সবে উঠে এই ঘরখানি গোছগাছ করছিলেন। এমন সময় বাইরে রিক্সার ঠুং ঠুং শব্দে চকিত হয়ে হাতের কাজ ফেলে রেখে জানালার বাইরে চাইলেন। একটু পরেই শৈলবিহারী প্রবেশ করলেন।

শৈলবিহারী এখানকার কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। বয়স চুয়াল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু মাথায় বিস্তীর্ণ টাকের জন্যে আরও বেশি লাগে। দোহারা শরীরের বাঁধুনি। গোঁফদাড়ি কামান। পরনে খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি ও চাদর]

শৈলবিহারী—তাড়াতাড়ি কিছু খাবার করে দিতে পার? আমাকে এখনি বেরুতে হবে।

সুরুচি—হঠাৎ?

শৈল—হ্যাঁ, সাড়ে চারটের মোটরে বাবা আসছেন, সঙ্গে কনক। টেলিগ্রাম এসেছে।

[শৈলবিহারী পকেট থেকে একখানি চিঠি আর একখানা টেলিগ্রাম বা'র করে টিপয়ের উপর রাখলেন।

শৈল—[সকৌতুকে] ও, তুমি বুঝি আবার ইংরিজী জাননা।

সুরুচি—[লজ্জিত হাস্যে] চিঠি কার?

শৈল—বাবারই। যাত্রা করার আগে নেপাল থেকে লিখেছিলেন। টেলিগ্রাম খানা কলকাতা থেকে করেছেন।

সুরুচি—[চিঠিখানা খুলে বার দুই নাড়াচাড়া করে] বাবাকে আমি কখনও বাঙলাতে চিঠি লিখতে দেখলাম না।

শৈল—[হেসে] না, দীর্ঘকাল নেপালে থেকে বাঙলা বোধ হয় ভুলেই গেছেন।

সুরুচি—দাঁড়াও। তোমার খাবারের কথাটা বলে দিয়ে আসি।

[প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।

সুরুচি—বিয়ের সময় তাঁকে প্রথম দেখি। কিন্তু সে আমার মনেও ছিল না। আসলে তাঁকে একবারই দেখেছি। মায়ের মৃত্যুর সময়।

শৈল—[হেসে] আমিও তোমার চেয়ে আর একবার মাত্র বেশী দেখেছি, কলকাতায় এম-এ পড়বার সময়। সকালে হষ্টেলে বসে পড়ছি, একটা জমকালো উর্দ্দী-পরা লোক এসে একখানা চিঠি দিলে। বাবার চিঠি। কি একটা প্রয়োজনে নেপালের মহারাজকুমারের সঙ্গে কলকাতায় এসেছেন দিন কয়েকের জন্যে। নিচে নেমে দেখি, প্রকাণ্ড বড় একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। বাবার সঙ্গে দেখা করে এলাম, পাঁচ মিনিটের জন্যে। [একটু থেমে] সেবার কদিন বাবা কলকাতায় ছিলেন জানিনা। কিন্তু দেখা একবারই হয় [বিষণ্ণভাবে হাস্য]।

[ঠাকুর খাবার দিয়ে গেল। সুরুচি নিজের হাতে আসন পেতে জল দিলেন। শৈলবিহারী আসনে বসলেন।

সুরুচি—[একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে] তোমরা তাঁকে এত ভয় কর কেন জানিনা। আমার তো বেশ ভালো লাগে।

শৈল—[একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে] ভয় নয় সুরুচি, ভয় নয়।

সুরুচি—তবে ?

শৈল—কি জানি কি, কিন্তু মায়ের জীবিতকালে এ বাড়ীতে তাঁর সম্বন্ধে কোন আলোচনা কখনই হয়নি।

সুরুচি—সে আমিও জানি! কেন হয়নি তাই জানতে চাই।

শৈল—তুমি কি বাবার সম্বন্ধে কিছুই শোননি ?

সুরুচি—শুধু এইটুকু শুনেছি যে, বহুকাল পূর্ব্বে এম-এ পাশ করেই তিনি নেপালের মহারাজকুমারের 'গার্জ্জেন টিউটার' হয়ে নেপাল চলে যান। তাঁর অতিমাত্রায় সাহেবিয়ানা নাকি তাঁর বাপ-মা সহ্য করতে পারেননি। তোমার মাও না। এই নিয়েই নাকি ছাড়াছাড়ি। তিনিও বাড়ী আসা বন্ধ করলেন, তোমরাও চিঠি দেওয়া বন্ধ করলে। এই তো ?, —না—আরও কিছু আছে ?

শৈল—বোধ হয় আরও কিছু আছে। কিন্তু সে যে ঠিক কি, তা আমিও জানিনা। অল্প অল্প মনে পড়ে, তখন আমার বয়স সাত কি আট, মা একবার নেপাল গিয়েছিলেন।

সুরুচি—তুমি যাওনি ?

শৈল—না, মা একাই গিয়েছিলেন। আমাকে চোখের আড়াল করা তখন দাদুর আর ঠাকমার পক্ষে অসম্ভব। উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে আমি কাছে না থাকলে বুড়োবুড়ি দু-জনেই

চোখে অন্ধকার দেখতেন [হাস্য]। সুতরাং আমার আর যাওয়া হয়নি।

সুরুচি—তারপর ?

শৈল—মা একাই গেলেন। কিন্তু মাত্র মাস ছয়েকের জন্যে। তারপর একদিন অকস্মাৎ মামাকে টেলিগ্রাম করে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ফিরে এলেন আমাদের বাড়ী। কেন যে তিনি এমন অকস্মাৎ চলে এলেন, কী যে হয়েছিল বাবার সঙ্গে, কোথায় পেলেন আঘাত, সে কথা একমাত্র তাঁর শাশুড়ী ছাড়া আর কাউকে বলেননি। সেই সময় থেকেই বাবার সঙ্গে দেশের এবং আমাদের সকলের সমস্ত সম্পর্ক লোপ পেল। বাবা শীতের সময় যে একবার বাড়ী আসতেন, তাও বন্ধ হল। এমন কি পত্র-ব্যবহারও।

সুরুচি—এর কারণ কিছুই অনুমান করতে পার না ?

শৈল—কিছুমাত্র না।

সুরুচি—আশ্চর্য !

শৈল—আশ্চর্যই তো। [হঠাৎ তাড়াতাড়ি]—উঃ ! চারটে বাজে যে ! আমি চললাম। হঠাৎ কি মনে করে যে আসছেন… আশ্চর্য বটে !

[শৈলবিহারী ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চলে গেলেন। সুরুচি চাকরকে ডাকলেন, চাকর এসে খাবারের জায়গা উঠিয়ে নিয়ে গেল। সুরুচি বুক-কেসের বইগুলো সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

রামেন্দুর প্রবেশ। তার হাতে এক গাদা বই।

রামেন্দু—বাবা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে কোথায় গেলেন মা ?

সুরুচি—তোর দাদু আসছেন যে রামেন্দু। এই সাড়ে চারটের মোটরে।

রামেন্দু—[সবিস্ময়ে] দাদু ?

সুরুচি—হ্যাঁরে, সঙ্গে কনক শুদ্ধ আসছে।

রামেন্দু—হঠাৎ দাদু যে ? নেপাল থেকে ?

সুরুচি—তাই তো শুনছি। নেপাল থেকেই আসছেন বোধহয়। কেন যে আসছেন কে জানে। তোর আনন্দ হচ্ছে না রামেন্দু ?

রামেন্দু—হচ্ছে মা। কেন জানিনা, দাদুকে আমার মাঝে মাঝেই মনে পড়ে। সেবারে ঠাকমার কাজের সময় সেই যে ক'দিনের জন্য দেখা,—কি আনন্দেই সে কদ্দিন কেটেছিলো। তার স্মৃতি আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। [রামেন্দু চঞ্চল হয়ে উঠলো] আর মনে পড়ে মা, দাদুর সেই আশ্চর্য সুন্দর হাসি। অমন করে আর কাউকে হাসতে দেখলাম না।

সুরুচি—সত্যি। কিন্তু কদিন থাকবেন কে জানে ?

রামেন্দু—এবারে কিন্তু অনেকদিন আটকে রাখতে হবে মা। কিছুতে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

[হালদার সাহেব, শৈলবিহারী ও কনক প্রবেশ করল। হালদার সাহেবের বয়স সত্তর। মাথায় প্রকাণ্ড টাক, মুখে সপ্তম এডওয়ার্ড প্যাটার্নের পাকা দাড়ি, মুখে শিশুসুলভ সরল হাসি। রঙ খুব ফর্সা। মাথায় শৈলবিহারীর চেয়ে কয়েক ইঞ্চি লম্বা। পরিধানে ইংরাজী পোষাক। সুরুচি তাড়াতাড়ি প্রণাম করল।

হালদার—এই যে ছোটমা ! ভালো ?

[সুরুচি নিঃশব্দে হাসলেন ।

হালদার—Good । এই দেখ তোমার মেয়ে···তোমাদের বসবার ঘরটা কোথায় ?···আমার আবার পায়ে বাতের জন্যে ···সমস্ত দিন ট্রেনে···কাণ্ড ।

কনক—চলুন, আমি দেখাচ্ছি ।

[হালদার ও কনকের প্রস্থান ।

সুরুচি—এই দশবছরে বাবা যেন বিশেষ রকম বুড়ো হয়ে 'গেছেন । তোমার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি লম্বাই হবেন, রঙও কিছু ফর্সা । কিন্তু এবারে একটু কুঁজো হয়ে পড়ায় আগের চেয়ে বেঁটে দেখাচ্ছে । শুধু অবিকল সেই রকম আছে তাঁর ছোট ছেলের মতো হাসিটুকু ।

শৈল—বাবার শরীরটা বিশেষ ভালো দেখাচ্ছে না ।

[কনক মায়ের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল ।

সুরুচি—বোধহয় সেই জন্যেই আমাদের কাছে এসেছেন । আর ছাড়া হবে না ।

কনক—হ্যাঁ, সেই জন্যেই বৈকি ! আমি চিঠি দিয়েছিলাম ভাই ।

সুরুচি—তুই ওঁকে আসতে লিখেছিলি ?

কনক—না, ঠিক তা লিখিনি । লিখেছিলাম, বন্ধুদের সবাই কত দাদুর কথা বলে । শুধু আমিই আমার দাদুর কথা কিছু জানিনা । জ্ঞান হবার পরে তাঁকে দেখিনি পর্যন্ত । পরের ডাকে চিঠি পেলাম, উনি আসছেন ।

সুরুচি—বেশ হয়েছে। কিন্তু আমিও সহজে ছাড়ছি না। যাবার নাম করলেই এমন ঝগড়া করব!

কনক—আহা তাই বৈকি, উনি যে কলকাতায় বাসা করছেন। নেপালে তো আর যাবেন না। আমি ওঁর কাছে কলকাতার বাসায় থেকে পড়বো।

শৈল—[সভয়ে] এসব আবার কখন ঠিক হ'ল?

কনক—হয়েছে, গাড়ীতে।

শৈল—বাবার চায়ের···

সুরুচি—হ্যাঁ, যাচ্ছি।

[শৈলবিহারী ও সুরুচির প্রস্থান। একখানা পড়ার বই হাতে রামেন্দু ঘরের ভিতর উঁকি দিলে।

কনক—দাদুকে দেখলে? সমস্ত-রাস্তা কি আমোদ করতে করতে যে এলেন!

রামেন্দু—কিন্তু সমস্তক্ষণ সাহেবী পোষাকে থাকেন কেন? Ludicrous!

কনক—তা ওঁর ওই পোষাকেই যদি আরাম হয়, তোমার আপত্তির কি আছে?

রামেন্দু—আমার আপত্তির কি আছে? বাঃ!

কনক—কিছুই না জেনে তুমি দাদুর সম্বন্ধে যা-খুশি-তাই বলো না।

[প্রস্থান

[সে পাশের বড় হল ঘরে এল। এ ঘরখানি সোফায় ও সেত্তিতে সাজান। হালদার সাহেব তারই একখানিতে বসে নিঃশব্দে পাইপ টানছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। দূরে আমলকি বনের মাথায় চাঁদ উঠেছে। তারই আলোতে ঘর নীলাভ। হালদার সাহেব তন্ময় হয়ে তাই দেখছেন।

কনক—কেমন লাগছে ?

হালদার—Glorious ! কিন্তু তুমি ওইখানে বসলে ?

কনক—আর কোথায় বসবো ?

হালদার—তাই বসো। সেকালের নাতনীরা এসে কিন্তু আধ আঁচরে বসতো।

কনক—যান ! মা কি বলছিলেন জানেন দাদু ? বলছিলেন এখান থেকে এক পা নড়বার নাম করলে আপনার সঙ্গে এমন ঝগড়া করবেন যে, থেকে যাবার পথ পাবেন না।

হালদার—[গম্ভীরভাবে] ভা-রী অন্যায়।

কনক—কেন ?

হালদার—নিরীহ অসহায় ভদ্র-সন্তানকে হাতের মুঠোয় পেয়ে তাকে জামাই করবার মতলব তো ভালো নয়।

কনক—[দাদুর মুখে হাত চাপা দিয়ে] আবার সেই সব কথা ?

[হালদার সাহেব ধীরে ধীরে ওর হাত দু'খানি নিজের বড় বড় মুঠোর মধ্যে নিলেন। আলোকিত আকাশের দিকে চেয়ে তিনি কি যেন ভাবছিলেন। হঠাৎ কনকের মনে হল, তিনি যেন প্রচণ্ড একটা কান্না

প্রাণপণ বলে চাপবার প্রয়াস পাচ্ছেন। সে ব্যস্ত
হয়ে উঠলো।

কনক—আপনি কাঁদছেন দাদু? কেন কাঁদছেন?

হালদার—[গলা ঝেড়ে] কেন যে কাঁদছি সে কি আমি বললেই বুঝবি দিদিভাই! আমার মতো বয়স যেদিন পাবি, সেদিন এমনি সন্ধ্যায় নাতি-নাতনীদের মধ্যে বসে নিজের কাছ থেকেই এর জবাব পাবি। [গভীর স্নেহে ওর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে] তোর ঠাকুমাকে যখন নেপাল নিয়ে যাই, তোর বাবার তখন আমাদের সঙ্গে যাওয়া হ'ল না। সে রইলো আমার বাপ-মার কাছে। এখন বুঝেছি কেন!

কনক—দাদু, আপনি যাবেন না।

হালদার—যাব না?

কনক—না। জানেন আপনি আমাদের জন্য কি এনেছেন?

হালদার—জানিনা তো।

কনক—এনেছেন আমাদের মনে একটা দিগন্ত-বিস্তৃত অবকাশের আমেজ। আমাদের এই ছোট পৃথিবীতে এতদিন ছিলেন কেবল বাবা, মা, দাদা। নিয়মের শিকলে সেখানে শৃঙ্খলিত পাখীর মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হ'ত। সুযোগ ছিল না বড় করে ডানা মেলবার। এমন সময় মানবাত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের মতো এলেন আপনি, এসেই একটা ঝাপটায় আকাশের সঙ্কীর্ণতা দিলেন ভেঙে। আজকের চন্দ্রালোকিত আকাশের মতো আরও একটা আকাশের সন্ধান পেে

আত্মহারা হয়ে গেলাম। জানেন দাদু, স্বপ্নের মত রহস্যময় সে আকাশ।

[রামেন্দুর প্রবেশ। হালদার সাহেবের বাম হাতখানি তখনও কনকের পিঠের ওপর। ডান হাত দিয়ে রামেন্দুকে কাছে আকর্ষণ করে বললেন।

হালদার—কি ভাই, ঘরের মধ্যে থেকে ভরসা হল না? দেখতে এলে বোনটিকে নিয়ে পালিয়ে গেলাম কি না? [কনকের মাথার চুলগুলি নাড়তে নাড়তে] দেখছ ভাই, এরই মধ্যে কি রকম জমেছে! আবার বলছে, কলকাতায় বাসা...উঃ!

রামেন্দু—কি হল?

হালদার—চিমটি কাটছে।

[পাইপটি ভর্ত্তি করে দেশলাই জ্বাললেন।

কনক—আপনি অত চুরুট খান কেন? বাবাঃ! মিনিটে মিনিটে। দাঁড়ান, কাল ওটাকে লুকিয়ে রাখছি।

হালদার—সর্বনাশ! এখন আর ওটাকে লুকিয়ে রাখিসনে ভাই। সংসারে সবই একে একে হারিয়ে গেল, শুধু এই পাইপটাই রয়েছে। যে কটা দিন আছি, ওটাকেও থাকতে দে।

রামেন্দু—আচ্ছা, পাইপের কথা থাক। কিন্তু আপনি কি বাঙালী পোষাক পরেন না?

হালদার—না।

রামেন্দু—কেন? লজ্জা করে?

হালদার—লজ্জা নয়, অসুবিধা হয়।

রামেন্দু—চার কোটি লোকের অসুবিধা হয় না, একা আপনারই যত অসুবিধা হয় ?

হালদার—নেপালে থাকতে হলে···

রামেন্দু—এটা তো আর নেপাল নয় ?

হালদার—না, কিন্তু যে পোষাকে পঞ্চাশ বছর ধরে অভ্যস্ত হয়ে আছি, একদিনে তা ছাড়া কঠিন। [হেসে] ভুলে যেওনা, আমি তোমাদের শতাব্দীতে জন্মাইনি। কিন্তু সে ত্রুটি বাঙলা দেশে থাকলে যদি বা শুধরে নিতে পারতাম, নেপালে গিয়ে সে সুযোগ আর পেলাম না। সেখানে তোমাদের শতাব্দী এখনও গিয়ে পৌঁছুতে পারেনি। সুতরাং অনেক যায়গায় আমার সঙ্গে তোমাদের মিলবে না। তা না মিলুক। সকলের সঙ্গে সব জায়গায় যে মিলতেই হবে, তারও তো কোন মানে নেই। কি বল ?

[সুরুচির প্রবেশ।

সুরুচি—এখন খাবার দেওয়া হবে ?

হালদার—এখন ক'টা ?

সুরুচি—দশটা বেজে গেছে।

হালদার—ওহো এত রাত্রি হয়ে গেছে। আমি নটার সময় খাই। ঠিক নটায়, কাঁটায়-কাঁটায়। বুঝলে ছোট মা, কাল থেকে···

সুরুচি—তাই হবে। আপনি তো বলেননি।

হালদার—খেয়াল ছিল না !

[ইতিমধ্যে বুধিয়া চাকর মেঝেয় কার্পেটের আসন পেতে জল দিয়ে গেল।

হালদার—তবেই তো মুস্কিল করলে ছোটমা। এই পোষাকে মেঝেয় বসা…

সুরুচি—তার আর মুস্কিল কি! ওরে বুধিয়া, এই ঘরে একটা টেবিল নিয়ে আয় তো।

কনক—[ফিক করে হেসে] মোটে একটাই তোমার টেবিল মা, তাও খাবার টেবিল নয়।

সুরুচি—তা একটা টিপয় দিলেও তো হয় বাপু। তোরা যতক্ষণ তর্ক করিস, ততক্ষণ দশটা কাজ হয়ে যায়।

[চাকর টিপয় দিয়ে গেল। সুরুচি নিজে খাবার নিয়ে এল।

হালদার—শৈলকে দেখছি না ছোটমা?

কনক—তিনি আহ্নিকে বসেছেন।

হালদার—আহ্নিকে? সে আবার পূজো-আহ্নিক করে নাকি?

কনক—হ্যাঁ।

হালদার—[রামেন্দুকে] তুমিও কি পূজা আহ্নিক কর না কি?

সুরুচি—ও কুস্তি করে।

হালদার—Good.

কনক—আপনাদের সময়ে ও সবের চলন খুব বেশী ছিল, না দাদু?

হালদার—মোটেই না। কিন্তু নেপালে এ সবের যথেষ্ট চর্চা আছে। বিশেষ করে শিকারে…

কনক—আপনি শিকার করতে পারেন?

হালদার—পারতাম। নেপাল দরবারের মত জায়গাতেও আমার

শিকারী বলে নাম ছিল। বুড়ো হয়েছি, এখন হাত কাঁপে।

সুরুচি—রামেন্দু, শোন।

[রামেন্দু মায়ের পিছু পিছু বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

সুরুচি—কাল সকালে তোমাকে একবার বাইসিকেল নিয়ে চট্ করে পেঠিয়া থেকে ঘুরে আসতে হবে যে বাবা।

রামেন্দু—পেঠিয়া কেন মা ?

সুরুচি—তোমার দাত্নর জন্যে একটু মাংস আনতে হবে। লক্ষ্মী, মাণিক, ফিরে এসে পড়তে বোসো।

রামেন্দু—(সবিস্ময়ে) মাংস কি মা ! এ বাড়ীতে মাছ ঢোকে না যে !

সুরুচি—[বিরক্ত ভাবে] সে যাদের জন্যে ঢোকে না, তাদের জন্যে ঢোকে না। বাবার জন্যে রোজ একটু মাংস চাই।

রামেন্দু—তোমার বাবার কথাটা বুঝলাম মা, কিন্তু আমার বাবার কথাটা বোঝ।

সুরুচি—[কঠোর কণ্ঠে] দরকার থাকে সে আমি বুঝবো। তুমি তর্ক না করে যা বলছি তাই শোন।

[রামেন্দু হালদার সাহেবের কাছে ফিরে আসতেই কনক তার মা'র কাছে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

কনক—[চুপি চুপি হালদার সাহেবের প্লেটের দিকে ইঙ্গিত ক'রে] ওগুলো কিসের ডিম জানতো মা ?

সুরুচি—জানি, তুই চুপ কর !

কনক—আমি না হয় চুপ করলাম, কিন্তু বাবা জানতে পারলে আস্ত রাখবেন না।

সুরুচি—তাঁকে জানাবারই বা তোমার এমন কি তাড়াতাড়ি পড়েছে ?

কনক – না তাই বলছি। কিন্তু ওগুলো সিদ্ধ করলে কে ? ঠাকুর তো ছোঁবে না। তুমি নিজে ?

সুরুচি—তোমার অত খবরে দরকার কি শুনি ?

কনক—[হেসে] কিছু দরকার নেই। আমি বলছিলাম, তোমার বাবার জাত তো জাহান্নমে গেছেই, আমার বাবার জাতটা আর সেখানে পাঠিও না।

সুরুচি—[হেসে] তোমাদের সবারই জাত ঠিক-ঠিক থাকবে মা, তুমি এখন ওঁর খাবার কাছে দাঁড়াও গে।

[সুরুচি প্রস্থান করতেই কনক হালদার সাহেবের ঘরে ফিরে এল।

হালদার—[রামেন্দুকে] তুমি শিকার করতে পার ?

রামেন্দু—না।

হালদার—পারা উচিত। ওতে স্নায়ুর শক্তি বাড়ে। নেপালের সবাই অল্প বিস্তর শিকারী। ওটা ওদের খেলার অঙ্গ। শৈলর বন্দুক নেই ?

কনক—বাবা হিংসা পছন্দ করেন না।

হালদার—না করুক। আমার বন্দুক আছে। তোমাকে আমি

বন্দুক ব্যবহার শিখিয়ে দোব। আগে টার্গেট প্র্যাকটিস্ করবে। তারপর ছোট ছোট শিকার। তার পরে Big game.

কনক—[হেসে] তবেই হয়েছে। দাদা যা ভীতু। রাত্রে একলা বাইরে বেরুতে পারেনা।

রামেন্দু—আহা, খুব ইয়ার্কি করতে শিখেছিস্?

হালদার—ও সব কিছু নয়, কিছু নয়। আমি বলছি, কিছু নয়। কোন মানুষই যথেষ্ট ভীতু নয়। আবার কাউকেই যথেষ্ট সাহসী বলতে পার না। সব অবস্থার ওপর নির্ভর করে। মেজর আর্মষ্ট্রং কামানের গোলার সামনে অবহেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু ওপরওয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপে। ভয় আর সাহস দুটো জিনিষই···উঁ?···Relativeএর বাঙলা কি?

রামেন্দু—আপেক্ষিক।

হালদার—Thank you. ও দুটোই আপেক্ষিক। অর্থাৎ একা একা ভয় পাওয়াও চলে না, সাহস দেখানও যায় না। ওর মধ্যে একটা দ্বিতীয় পক্ষ চাই। উঃ? আমি এমন লোককে জানি, সোমবার রাত্রি পর্য্যন্ত যার ভীরুতা পরিচিত লোকের পরিহাসের বস্তু ছিল, মঙ্গলবারের দিন সে হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড করে বসলো যে ইতিহাসে তার নাম রয়ে গেল।

কনক—তা কি হয়?

হালদার—তাই-ই হয়। আমরা [illegible] করীর মতো

মানুষের গায়ে নিশ্চয় করে লেবেল মারা যায় না। তার পরে অত্যন্ত সহজে চেনা লোককে আমরা ভুল বুঝি। অনেক সময় Bully কে ভাবি বীর। সুসংযত, ভদ্রকে ভাবি ভীরু। হুঁ? আমার টুবাকো?

কনক—আনছি।

[প্রস্থান।

হালদার—সাহসী হবার জন্যে আসলে কি চাই জান? অপর পক্ষের দুর্ব্বলতার সন্ধান। আর খানিকটা নার্ভ। তুমি বাঘ শিকার করতে চাও? বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার আগে তোমাকে জেনে যেতে হবে কোথায় বাঘের দুর্ব্বলতা। প্রথমবার তবু হয় তো ভয় হবে। সে জন্যে ভাল শিকারীর সঙ্গে যেতে হয়। তারপর যেই একবার উৎরে এলে, অমনি সমগ্র ব্যাঘ্র সম্প্রদায় তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল।

রামেন্দু—আপনার বন্দুকটা এখন একবার দেখতে পারি?

হালদার—কাল সকালে শিখিয়ে দেব।

রামেন্দু—তা দেবেন। কিন্তু এখন একবার···শুধু দেখা!

হালদার—Certainly, here is the key.

[রামেন্দুর চাবি লইয়া প্রস্থান। অন্য দরজা দিয়া কনক ও লিলির প্রবেশ।

কনক—দাদু ভাই, এটি আমার বন্ধু লিলি সরকার। ওই সামনের বাড়ীটা এদের। এর বাবা মিঃ এলয়সিয়াস গোপেন্দ্র সরকার

এখানকার হিষ্ট্রির প্রোফেসার। আপনাকে দেখবার জন্তে এত ব্যস্ত হয়েছে যে সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবার তর সয়নি।

[লিলি হালদার সাহেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

হালদার—বিলক্ষণ। বস, বস। তুমিও কলেজে পড়?

লিলি—আমরা এক সঙ্গেই পাশ করেছি। ও বেথুনে পড়ে, আমি ডায়োসিসানে।

হালদার—Good! ও ছোটমা!

[সুরুচির প্রবেশ।

হালদার—এসে এসেই আমার কত বন্ধু জুটে গেল দেখ। এর নাম লিলি।

সুরুচি—হ্যাঁ, কনকের বন্ধু। বড় ভাল মেয়ে। গেলবার জলপানি পেয়েছে।

হালদার—(সবিস্ময়ে) উঁ?

সুরুচি। লিলি খুব ভাল নাচতে পারে, জানেন বাবা?

হালদার—সত্যি? কি নাচ? ফক্সট্রট? ও এইসব দিশী নৃত্য। হংস নৃত্য, সর্প নৃত্য, গণেশ নৃত্য? ও সব জানিনা।

[সুরুচি হেসে পালালো

কনক—আপনি বুঝি শুধু ফক্সট্রট জানেন?

হালদার—জানতাম। তা হোক। তোমার ওই দিশী নাচ আজ দেখবো লিলি। এইখানে। কিম্বা এক কাজ করলে হবে

শালবনে ফুল ফুটেছে। কাল বিকালে ওই দিকে বেড়াতে যাওয়া যাবে। কি বল? উঁ? কনক ভাল গাইতে পারে। তুমি নাচতে পার। শালের বনে ফুল ফুটেছে।

লিলি—মহুয়া আছে, পলাশ।

হালদার—আছে? Good, একটা কবিতা শুনতে ইচ্ছে করছে। পার শোনাতে? বেশ ভালো একটা কবিতা।

[কনক লিলির দিকে চাইবে

লিলি— সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'ল—যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার।

হালদার—Good!

লিলি— এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগী!
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে
হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনোখানে।

হালদার—[অস্ফুট মৃদু কণ্ঠে] Good! রবীন্দ্রনাথের কবিতা, ওঁর সব কবিতা আমি পড়েছি। সময় পেলেই পড়ি। Good.

কনক—[লিলিকে চুপি চুপি] দাদুকে কেমন লাগছে?

লিলি—[চুপি চুপি] Oh! he is great!

[২]

শৈলবিহারীর পূজার ঘরের সম্মুখের বারান্দা। তাঁর পরিধানে পট্টবস্ত্র। নাসিকায় ও ললাটে তিলক। শিখায় পূজার ফুল বাঁধা। পূজা শেষ করে বেরিয়ে আসতেই তাঁর পায়ে একটা কি ঠেকলো।

শৈল—[বিরক্ত ভাবে] শুনছ ?

সুরুচি—[নেপথ্যে] কি বলছ ?

শৈল—এদিকে এস তো।

[সুরুচির প্রবেশ।

সুরুচি—কি বলছ ?

শৈল—[আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন] কি ওটা ?

সুরুচি—[সভয়ে] ওমা ! এত বড় একটা হাড় এল কি করে ? নিশ্চয় ইঁদুর কিম্বা অন্য কিছুতে এনে থাকবে। এক্ষুণি আমি··· [প্রস্থানে উদ্যত

শৈল—দাঁড়াও। কি তোমাদের ইচ্ছা বলো তো ? আমি কি এ বাড়ী থেকে উঠে যাব ?

সুরুচি—উঠে যাবে কেন ? কি এমন হয়েছে ? এমন কিছু অখাদ্য জন্তুর হাড় নয়। কেউ ইচ্ছা করে ওখানে রেখেও যায়নি। পায়ে ঠেকলো, চান করে এস, ফুরিয়ে যাবে। তাই নিয়ে কি বাড়াবাড়ি করতে হবে ? সংসারে পিতৃভক্তি বলে কি কিছুই নেই ?

শৈল—পিতৃভক্তি ! যিনি সমাজ, সংসার সমস্ত ত্যাগ করে চিরকাল স্বেচ্ছাচার করে এলেন। যাঁর খাদ্যাখাদ্যের বিচার নেই লোভের তাড়নায় যিনি পিতৃপুরুষের ধর্মের পর্যন্ত মর্যাদা রাখেননি ··[নিষ্ঠুরভাবে হাস্য]

সুরুচি—না রাখেননি। কিন্তু তাতে তোমার কি ? পিতৃপুরুষের ধর্ম ? তোমার তো উনি পিতা। ওঁর ধর্মই তো তোমার ধর্ম।

শৈল—কখন না। আমি ব্রাহ্মণ; আমার পিতৃপুরুষের যে ধর্ম, তাই আমার ধর্ম। আমরা ওঁকে মৃত বলেই মনে করি।

সুরুচি—উত্তম কর। কিন্তু আমি এখনও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ততখানি অনুরাগিনী হতে পারিনি। উনি যখন এতকাল পরে ফিরেছেন, তখন কিছু-কিছু অনাচার হবেই। আমি ছেলের বৌ হয়ে তা যদি সইতে পারি, তুমি ছেলে হযে তা সইতে পারবে না ?

শৈল—না, এ বাড়ীতে আমি মায়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দেবনা।

সুরুচি—বেশ তো। আমিও তো ছেলের মা, আমারও তো একটা মর্যাদা আছে।

শৈল—বেশ। তা হলে তোমাদের মর্যাদা নিয়ে তোমরাই এ বাড়ীতে থাক। আমি অন্য কোথাও উঠে যাচ্ছি।

সুরুচি—যেতে পার। কিন্তু এমন কেলেঙ্কারী করে যেতে পারবে না। বাবা জানতে পারবেন, সবাই জানতে পারবে, তাই নিয়ে কানাঘুসো করবে, সে হতে পারবে না। যেতে চাও দুদিন

পরে যেও। কিম্বা আর ক'টা দিন থাক, কনকের কলেজ খুলুক, তারপরে আমিই বাবাকে নিয়ে কলকাতা যাব। সেই ক'টা দিন তোমার ব্রাহ্মণ্য দেবতাকে একটু সাবধানে রেখ।

[প্রস্থানে উদ্যত

শৈল—শোন।

সুরুচি—বল।

শৈল—আবার একটা টেবিল এল কেন?

সুরুচি—বাবার খাবার টেবিল।

শৈল—এ বাড়ীতে কি অতঃপর টেবিলে খাওয়া হবে?

সুরুচি—সকলের জন্যে নয়। কেবল বাবার জন্যে।

শৈল—মাকে তোমার মনে পড়ে?

সুরুচি—পড়ে। কিন্তু মায়ের হুকুম আমাদের জন্যে, বাবার জন্যে নয়। আবার এও বলি, মায়ের যেমন হুকুম দেবার অধিকার ছিল, বাবারও তেমনি আছে

শৈল—বাবার সম্বন্ধে তুমি কিছুই জাননা।

সুরুচি—জানবার প্রয়োজন কি?

শৈল—ছেলে মেয়ে দুটোকে পর্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছেন।

সুরুচি—তুমি বাজে বকোনা।

[প্রস্থান।

শৈল—হুঁ। কনক!

[কনকের প্রবেশ।

কনক—কি বলছেন?

শৈল—দিনরাত্রি তো হাসি গান শুনতে পাচ্ছি। পড় কখন?

কনক—পড়ি তো।

শৈল—ছাই পড়। সে ছোঁড়া কোথায়?

কনক—দাদা পড়ছে।

শৈল—হুঁ, খুব পড়ায় চাড়! কাল শিকার থেকে ফিরলো কখন?

কনক—[নিরুত্তর]

শৈল—বুঝেছি, গোল্লায় যেতে বসেছ।

[প্রস্থান। কনক সবিস্ময়ে চেয়ে রইলো। তারপর হাত ইসারায় কাকে যেন ডাকলো। রামেন্দুর প্রবেশ।

রামেন্দু—হঠাৎ সকালেই বকাবকি আরম্ভ করলেন যে?

কনক—কি জানি! মেজাজ খুবই খারাপ। এখন দুদিন শিকার-টিকার বন্ধ রাখ দাদা, যদি ভালো চাও।

রামেন্দু—হুঁ, বন্দুকটা তুলে রেখে আসি। বিশেটা রয়েছে সেই আমাকে একদিন ডোবাবে দেখছি।

কনক—কি করলে সে?

রামেন্দু—করেনি কিছু, করবে। আমাকে খুন করবে, নিজে ফাঁসী যাবে, আর দাদু বেচারার নাকালের একশেষ হবে আস্ত পাগল!

[বন্দুক হাতে বিশ্বমোহনের প্রবেশ

রামেন্দু—এই! এই! কার্ট্রিজ আছে নাকি?

বিশু—আছে বই কি।

রামেন্দু—[বন্দুক কেড়ে নিয়ে] সারলে। তুই একদিন ডোবাবি বিশে।

বিশু—[তাচ্ছিল্যের সঙ্গে] পাগল! আমি শুধু দেখছিলাম…

[হালদার সাহেবের প্রবেশ

হালদার—[সস্মিত দৃষ্টিতে বন্দুকের দিকে চেয়ে] বাঃ! তোমার হাতে পড়ে বন্দুকটির যৌবন ফিরে এল দেখছি। আমি তো বহুদিন ওটাতে হাত দিইনি কিনা! [হঠাৎ] এ ছেলেটি কে?

রামেন্দু—প্রোফেসার বড়ুয়ার ছেলে। বিশ্বমোহন।

হালদার—তাই নাকি? Good. কিন্তু এ রত্নটিকে তো এতদিন দরবারে পেশ করনি? এখানে ছিল না নাকি?

রামেন্দু—ছিল। কিন্তু আপনার দাড়ির ভয়ে দরবার পর্য্যন্ত এগুতে সাহস করেনি।

হালদার—দাড়ির ভয়ে? এ্যাঁ! নতুন খবর বটে! Do you Smoke?

[সিগারেট বের করলেন।

বিশু—[চুপি চুপি রামেন্দুকে] সারলে রে! কোন দিন সিগারেট খেতে দেখেছেন নাকি?

হালদার—নাও না। লজ্জা কি? সিগারেট এমন কি খারাপ জিনিষ যে লুকিয়ে খেতে হবে?

[বিশু সিগারেটটা নিলে। হালদার সাহেব নিজেরটা ধরালেন। ওরটাও ধরিয়ে দিলেন।

হালদার—তুমি রামেন্দুর সঙ্গে পড়?

বিশু—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হালদার—বি-এ পাশ করে কি করবে? এম-এ পড়বে?

বিশু—ইচ্ছা আছে এরোপ্লেন চালানো শিখব।

হালদার—[সোল্লাসে ও করমর্দ্দন করে] Good. তুমি সত্যি সত্যি এরোপ্লেন চালানো শিখতে পারবে কিনা জানিনা। কিন্তু তোমার কল্পনার বলিষ্ঠতা আছে। Very Good. [রামেন্দুকে] আর তুমি?

রামেন্দু—আমার মালিক তো আমি নই দাদু?

হালদার—[দপ করে জ্বলে উঠলেন] My dear Sir, আঠার বছরের পরে প্রত্যেক সুস্থদেহ মানুষ নিজের মালিক নিজে। তুমি সারাজীবন খোকা সেজে থাকতে চাও থেকো। কিন্তু সে অবস্থাটা মানুষের পক্ষে শ্লাঘার বস্তুও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। এই যে লিলি!

[লিলির প্রবেশ।

লিলি—বাবা, মা, আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

হালদার—কোথায়?

লিলি—বসবার ঘরে।

[হালদার সাহেব কনক ও লিলিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বসবার ঘরে গেলেন। সে ঘর আমাদের পরিচিত। মিষ্টার ও মিসেস সরকার বসেছিলেন, হালদার সাহেব আসতেই উঠে দাঁড়ালেন। হালদার উভয়ের করমর্দ্দন করলেন।

মিসেস সরকার—সে দিন লাঞ্চের পরে আপনি কখন চলে এলেন জানতেও পারিনি। তাই ভাবলাম…।

হালদার—So very kind of you.

মিসেস সরকার—লিলির মুখে আপনার কথা এত শুনি!

মিষ্টার সরকার—Yes, you are always on Lily's lips.

মিসেস সরকার—আপনাদের নাকি ভারি ভাব হয়ে গেছে?

হালদার—[হাসলেন] হ্যাঁ, যেমন ভাব হয় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিউজিয়ামের।

মিসেস সরকার—Oh! you don't say that. আপনি…

হালদার [গম্ভীরকণ্ঠে] মিসেস সরকার, আমি অতীত শতাব্দীর ধ্বংসাবশেষ। আমাকে ওদের ভালো লেগেছে। আমি জানি কেন। এর মধ্যে সুখের কথা এই যে, আমার ভিতর দিয়ে ওদের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর আত্মার পরিচয় হচ্ছে।

মিঃ সরকার—আমিও তো উনবিংশ শতাব্দীর।

হালদার—না, আপনারা ঠিক…

মিঃ সরকার—আমাকে আপনি "তুমি"ই বলবেন বরং। আমি শৈলবিহারীর বন্ধু।

হালদার—[হেসে] আচ্ছা তাই বলবো। আমি বলছিলাম, তোমরা ঠিক আমাদের শতাব্দীর নও। আমাদের শতাব্দীর fag-endএ তোমরা এসেছ বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারাকে anticipate করে। তোমাদের সঙ্গে আমাদের মিল কম। অনেক ক্ষেত্রে আমরা পরস্পর বিরোধী, বরং তোমাদের

ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমরা আমাদের কালের অনেক চিন্তার টুকরো খুঁজে পাই। আশ্চর্য! [পাইপ ধরালেন] তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না। দুটো শতাব্দীকে পৃথক করে দেখতে তোমরা অভ্যস্ত নও। আমি বহুকাল পরে নেপাল থেকে ফিরে এলাম—রিপ ভ্যান উইংক্লের মতো। আমি বুঝতে পারছি, কি ছিল আর কি হয়েছে।

[হালদার সাহেব একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। লিলি ওঁর কানে কানে কি যেন বলল। সরকার দম্পতি উঠে দাঁড়ালেন।

মিঃ সরকার—আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন উঠি, নমস্কার।

হালদার—নমস্কার।

[সরকার দম্পতির প্রস্থান।

লিলি—আচ্ছা দাদু ভাই, কালকে খেতে বসে আপনি সুমুখের ছবিটার দিকে অবাক হয়ে কি দেখছিলেন বলুন তো?

হালদার—ও ছবিটা কার?

লিলি—আমার ঠাকুমার।

হালদার—আশ্চর্য!

লিলি—কেন বলুন তো?

হালদার—আমি একটি মেয়েকে জানতাম, অবিকল তার মতো। দুজন লোকের মধ্যে যে এমন আশ্চর্য সাদৃশ্য থাকতে পারে তা আমি ভাবতেই পারি না।

কনক—ছবিতে অমন লাগে। দুজনের চেহারায় মোটামুটি মিল থাকলেই ছবিতে একরকম দেখায়।

হালদার—অনেকদিন আগের কথা। নেপালে দেখেছিলাম। তখন তার বয়স উনিশ কুড়ি। আচ্ছা তোমার ঠাকুমা কখনও নেপালে থাকতেন ?

লিলি—[অন্যমনস্ক ভাবে] থাকতে পারেন। তারপরে বলুন।

হালদার—[একটা সিগারেট ধরিয়ে] সেই মেয়েটি আমার জীবনে একটা ভূমিকম্পের মত এসেছিল। আমার সমাজ, আমার সংসার, আমার গৃহ, সমস্ত তছনছ করে দিয়ে চলে গেল।

লিলি—[রুদ্ধ নিঃশ্বাসে] মারা গেলেন ?

হালদার—না। তারও চেয়ে বেশি। এ জীবনে আমার সঙ্গে আর দেখা হল না।

লিলি—কেন ?

হালদার—কারণ সে খৃষ্টান আর আমি হিন্দু। শুধু তাই নয়, আমি বিবাহিত এবং স্ত্রী বর্ত্তমান।

[লিলি নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগলো।

হালদার পরে শুনেছিলাম, কোথায় যেন একটা ভালো ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের সময় নিমন্ত্রণ করে নিজের হাতে চিঠিও দিয়েছিল। বটতলার উপন্যাসের নায়িকার মতো লিখে-ছিল নারী ও পুরুষের মধ্যে ওইটেই একমাত্র সম্পর্ক নয় বাকী জীবনে আমাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব যেন অক্ষুণ্ণ থাকে

[ম্লানভাবে হাসলেন

কনক—ওঁকে নিয়েই কি ঠাকুমার সঙ্গে আপনার চিরবিচ্ছেদ ঘটেছিল ?

হালদার—ওঁকেই নিয়ে। কিন্তু তোমার ঠাকুমার বিরুদ্ধে আমার বিশেষ অভিযোগ নেই। আমাদের মেলামেশা অন্তরঙ্গতা নিজের চোখে তিনি দেখেছিলেন। তারপরে কোনো ভদ্র মহিলাই তাঁর স্বামীকে মার্জনা করতে পারেন না। কিন্তু তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে, তোমাদের ঠাকুমা আমাকে ত্যাগ করেছিলেন অন্য মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপনের জন্যে নয়, খৃষ্টান মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপনের জন্যে। ভালোবেসে এবং ভালো না বেসে জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি। জীবনে অনেক কিছুর পরে পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষত আমার আজও শুকোলো না। আমার বিয়ে হয়েছিল পোনেরো বছর বয়সে। দুজনে খেলা করেছি, ঝগড়া করেছি, ভাব করেছি। কিন্তু ভালোবাসতে পারিনি। কলেজে পড়তে এসে দৃষ্টি গেল বদলে। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা নোলকপুড়া মেয়েকে কিছুতে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারলাম না। এমন সময় এল এডিথ্।

লিলি—[চমকে] এডিথ্ ?

হালদার—এডিথ্ তার নাম। উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে। কলেজে পড়ে। চমৎকার ইংরাজী বলে, দিব্যি স্মার্ট। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হল আমার আত্মা যাকে কামনা করছিল এতদিন পরে তাকে পাওয়া গেল। তখন বুঝিনি

সমাজ-বদ্ধ মানুষের জীবনে পাওয়া এত সহজ নয়। আত্মার আত্মীয়াও আমাদের নিজেদের তৈরী বিধানের ফলে পর হয়ে যায়।

[নিজের মনেই ঘাড় নাড়লেন।

লিলি—এডিথ্ কি সূত্রে নেপালে যেতেন ?

হালদার—তাঁর এক কাকা ওখানে বড় চাকুরী করতেন। তাঁর ছেলেপুলে ছিল না। এডিথ্কে তিনি বড় ভালো বাসতেন। বছরে গ্রীষ্মের তিনটি মাস এডিথ্ ওখানেই থাকতো।

[তিনজনে নিঃশব্দে বসে রইলেন।

লিলি—আচ্ছা দাদু ভাই, আপনি তাঁকে কি সত্যিই ভালোবেসে ছিলেন ?.না, তাঁর স্মার্টনেস্, চমৎকার ইংরাজী বলা, আপনাকে মুগ্ধ ক'রেছিল ?

হালদার—[আস্তে আস্তে] সত্যিই ভালোবেসেছিলাম। জীবনে সেই প্রথম এবং শেষ।

কনক—আচ্ছা এখন তিনি যদি হঠাৎ একমাথা পাকাচুল নিয়ে ফিরে এসে বলেন, আমায় খুঁজছিলে ? এই আমি ফিরে এলাম। তাহলে ?

হালদার—[অসহায় ভাবে] তাহলে ? কি জানি, এতকাল পরে হয়তো তাকে চিনতেই পারব না।

[কনক ও লিলি খুব জোরে হো হো করে হেসে উঠলো।

হালদার—যাক্‌গে সে পুরোনো কথা। কিন্তু আজকে কি কথা ছিল লিলি ?

লিলি—কি কথা ছিল মনে পড়ছে না তো দাহ্ভাই ?

হালদার—তোমার নাচবার আর কনকের গাইবার কথা ছিল না ?

লিলি—ছিল না কি ?

কনক—আমি প্রস্তুত।

লিলি—(নিজের পোষাকের দিকে চেয়ে) আমাকে তা হ'লে পোষাকটা ছেড়ে আসতে হবে দাহ্।

হালদার—উত্তম, আমি অপেক্ষা করে রইলাম।

[লিলি ও কনকের প্রস্থান। হালদার সাহেব পাশের টিপয় থেকে একখানা পঞ্জিকা নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। এমন সময় বিশু ও রামেন্দু প্রবেশ করলো।

রামেন্দু—ওকি দাহ্! আপনার হাতে পঞ্জিকা ? আপনি পঞ্জিকা পড়েন না কি ?

হালদার—নিয়মিত ভাবে। কিন্তু ওই দিনক্ষণগুলো নয়।

রামেন্দু—তবে ?

হালদার—বিজ্ঞাপন। বিশেষ করে. বিজ্ঞাপনের ছবিগুলো। একজন বলশালী পুরুষ হাতে করে একটা আস্ত গাছের গুঁড়ি চিরে হুভাগ করে ফেললে। আর একজন বাঁ হাতে একটা সিংহ আর ডান হাতে একটা হাতী শূন্যে তুলে ফেলেছে। কোথাও স্বয়ং মহাদেব এসে জরাজীর্ণ রোগীকে ঔষধ দিচ্ছে। কোথাও বা একটা অর্দ্ধ উলঙ্গ অপ্সরা আকাশ

পথে উড়ে যেতে যেতে বটিকা বিতরণ করছে। তুমি গোটা বাঙলা দেশের একটা বড় অংশকে ঐ বিজ্ঞাপনের মধ্যে দেখতে পাবে।

[ওরা হেসে উঠলো।

রামেন্দু—আপনি একটী পাগল দাদুভাই।

হালদার—[হেসে] পাগল নয়রে বোকা, একদিন নিরিবিলি পড়ে দেখিস। দেখবি কত সন্ন্যাসীদত্ত মাদুলী, ফকিরদত্ত তাবিজ, ঋষিদত্ত ওষুধ আর স্বপ্নদত্ত বটিকা এই একটা জাতকে নাগপাশে বেঁধে রেখেছে।

বিশু—ক্ষতি কি ?

হালদার—ক্ষতি নেই ? তোরা এই সব বিশ্বাস করিস নাকি ?

বিশু—আমরা ওসব বিশ্বাসও করি না, অবিশ্বাসও করি না। ওসব আমরা ভাবিই না।

হালদার—তার মানে ? এতে যে জাতির কত বড় ক্ষতি হচ্ছে সে তোরা স্বীকার করিস না ?

রামেন্দু—করতে পারি। কিন্তু আপনাদের মতো অতটা নিঃসংশয় নই।

বিশু—আপনাদের মতো এ বিশ্বাস করি না যে, ওগুলো থাকতে আমাদের মুক্তি নেই।

রামেন্দু—আমরা ধরে নিয়েছি আরও পাঁচটা বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত জিনিষের সঙ্গে ওগুলোও থাকবে।

বিশু—ওর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা সময়ের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়।

হালদার—সত্যিই ?

বিশু—সত্যি। কিন্তু আপনার বাহন দুটী কোথায় ?

হালদার—[হেসে] সাজতে গেছে।

রামেন্দু—আচ্ছা দাদু, আপনি অত পড়েন কেন ? শুনি বিলেত থেকে মাসে মাসে আপনার বই আসে। অত বই পড়ে কি হয় ?

হালদার—বোধ হয় বুদ্ধির কুয়াশা কাটে, চিন্তাধারা সত্য পথের সন্ধান পায়। বোধ হয়···

রামেন্দু—[হেসে] বোধ হয় কিছুই হয় না। আপনাদের কালে আপনারা অনেক পড়েছেন, কিন্তু কিছুই করে যাননি। আমাদের কালে আমরা বেশি পড়ি না, কিন্তু কিছু করে যেতে চাই। আমাদের একজন প্রোফেসর কি বলেন জানেন ?

হালদার—না।

রামেন্দু—তিনি বলেন, বেশি পড়লে বুদ্ধিটা ধনী হ'তে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে বিলাসীও হয়।

হালদার—সে ভদ্রলোক এখনও প্রোফেসারী করেন ?

বিশু—হ্যাঁ।

হালদার—বোধ হয় আর বেশীদিন করবেন না।

বিশু—তার মানে ?

হালদার—মানে আর একদিন বলবো। ওই ওদের পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ওরা এলো বলে। এবার তোমরা পালাও।

[এক প্রকার টেনে ওদের বা'র করে দিলেন। নাচতে নাচতে লিলি ও তার পিছনে গাইতে গাইতে কনকের প্রবেশ।

গান

হৃদয় দোলায় দোল্ দিয়ে যায়
যে গোপনে।
ফুলগুলি তার দল মেলে হায়
কার স্বপনে॥
কমল যেমন আলোর লাগি,
একলা রাতি কাটায় জাগি,
তেমনি আমার হৃদয় জাগে
তার ধেয়ানে॥
তার বারতা জেনেছিল সন্ধ্যাতারা,
নীল সায়রে তাই কি শশী তন্দ্রাহারা,
যখন অশোক চাঁপার বনে
মুকুল ফোটে আপন মনে
তার সনে মোর দেখা হলো
সেই লগনে।

হালদার—Good.

কনক—ভালো লাগল ?

হালদার—Marvellous. মনে পড়ছে Endymion এর সেই কটা লাইন :

Ah ! Ah ! What hast thou done !
for I am thrilled.
With perils in the enchanted dawn of time.
And I begin to sorrow for strange things
And to be sad with men long-dead ; O now
I suffer with old legends, and I pine
At long sea-glances for a single sail.

Good, very good. জানিস, খুব বড় আনন্দ আর খুব বড় দুঃখের অনুভূতি একই ?

কনক ও লিলি—(দাদুকে জড়িয়ে ধ'রে) দাদু, you are great, you are wonderful !

[৩]

হালদার সাহেবের শয়ন-কক্ষের একাংশ দেখা যাচ্ছে। সে ঘরে খাটের ওপর হালদার সাহেব নিদ্রিত। পাশের বারান্দায় সুরুচি আসনে বসে একটা বালিশের ওয়াড়ে ফুল তুলছিলেন। এমন সময় ব্যস্ত ভাবে শৈলবিহারী এলেন।

শৈল—শুনছ?

সুরুচি—[মাথা না তুলেই] না।

শৈল—আমাদের কলেজের ছেলেরা ষ্ট্রাইক করেছে।

সুরুচি—সে আবার কি?

শৈল—হ্যাঁ। ছেলেরা ষ্ট্রাইক করেছে। কেউ ক্লাসে যায়নি। যারা যেতে চায় তাদেরও বাধা দেওয়া হচ্ছে। এমন কি আমাদেরও। গেটের গোড়ায় ছেলেরা দল বেঁধে শুয়ে পড়েছে।

সুরুচি—বল কি গো?

শৈল—হ্যাঁ। শুনলে আশ্চর্য হবে, আমাদের রামেন্দু হয়েছে তাদের রিং লিডার।

সুরুচি—আমাদের রামেন্দু!

শৈল—(ঘুরে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমাদের রামেন্দু। দেখে এলাম। সেই সবচেয়ে বেশী মহাত্মার জয়নাদ দিচ্ছে। আর পতাকা ওড়াচ্ছে। আমাকে দেখে একটু ভয় পর্যন্ত পেলেনা।

সুরুচি—বাজে বোকনা। সে যে রাত্রে একলা বাইরে বেরুতে পারে না।

শৈল—এখন একবার গিয়ে দেখে এস।

[পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পোষাক ছাড়তে লাগলেন।

সুরুচি—সেই জন্যেই ওর ঘরে কদিন থেকে ফিস্ ফিস্ চলছিল।

শৈল—[সচকিত ভাবে] তাই না কি?

সুরুচি—হ্যাঁ। আর দলে দলে কেবল ছেলেরা আসছিল।

শৈল—একথা আমায় বলনি কেন?

সুরুচি—আমি কি ছাই জানি, ওরা ভেতরে ভেতরে এই মতলব করছিল। ছেলেরা তো এমন কতই আসে। আমি ভাবলাম তাই বুঝি। কেন ওরা ষ্ট্রাইক করলে?

শৈল—[বিরক্ত ভাবে] কে জানে! [একটু থেমে] একটি প্রোফেসরের বিরুদ্ধে পুলিশ কি বুঝি রিপোর্ট করেছে, কলেজ থেকে তাই তাঁকে ছাড়াবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এতেই বাবুদের রাগ!

সুরুচি—তা বাপু, সেও তো অন্যায়। পুলিশ কার নামে কি লাগিয়েছে, আর অমনি তাকে কলেজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে, এমনও তো ভালো নয়।

শৈল—ভালো নয়? তাদের কলেজ, তাদের যাকে খুশি রাখবে, যাকে খুশি তাড়াবে। এতে ছেলেদের বলবার কি আছে? তারা কেন জোট পাকিয়ে ষ্ট্রাইক করে?

সুরুচি—[মোলায়েম ভাবে] না, না, ষ্ট্রাইক করবে কেন, ঐ কথাটাই বলতে চায়, যে ছা-পোষা মানুষ··

শৈল—[রাগতঃ ভাবে] ছা-পোষা নয়। বিয়ে করেনি সে।

সুরুচি—না হয় করেন নি ; কিন্তু অনেক দিন তো আছেন। সেই বলা আর কি, যে ওঁকে যেন ছাড়ানো না হয়।

শৈল—ছেলেরা বললেই হয়ে গেল ? জান, ওদিকে পুলিশ··। ভদ্রলোক কি করে জান ?

সুরুচি—কি করেন ?

শৈল—বোমা তৈরী।

সুরুচি—[প্রথমে চমকে উঠলেন, তারপর শান্তকণ্ঠে] তুমি কি ক'রে জানলে ?

শৈল—সবাই জানে !

সুরুচি—সবাই জানে ? তিনি কি সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোমা তৈরী করেন ?

শৈল—আরে বাপু, পুলিশ কি মিথ্যে কথা বলছে ? তাদের স্বার্থ কি আমায় বুঝিয়ে দাও দেখি ?

সুরুচি—[বিরক্ত ভাবে] তুমি নিজে না বুঝলে আমার বুঝিয়ে দেবার সাধ্য নেই। এখন ক'টা ?

শৈল—তিনটে।

সুরুচি। এখন কি চা খাবে, না একটু পরে ?

শৈল—একটু পরে।

[দুজনে নিঃশব্দে ভাবতে লাগলেন।

সুরুচি—হ্যাগা, তা শেষ পর্যন্ত কি হবে মনে হচ্ছে ?

শৈল—হবে ভালোই। প্রিন্সিপ্যাল পুলিশে খবর দিয়েছেন। পুলিশ হয়তো এতক্ষণ এসে ঠেঙানি দিচ্ছে। ছেলেরা সুড় সুড় করে আবার কলেজে ঢুকবে। তাদের সব ফাইন হবে। যারা পাণ্ডা তাদের রাষ্টিকেশনও হতে পারে।

সুরুচি—[সভয়ে] ও।

[পাশের ঘরে হালদার সাহেবের নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

সুরুচি—[ব্যস্তভাবে] বাবা উঠেছেন বোধ হয়। তোমারও চা এই সময়ে দিই তাহলে ?

শৈল—দাও। আমার পড়বার ঘরে পাঠিয়ে দিও বরং।

[শৈলবিহারীর প্রস্থান। সুরুচি দরজা ঠেলে হালদার সাহেবের ঘরে এলেন।

হালদার—তোমার মেয়েকে দেখছিনে ছোটমা ?

সুরুচি—বোধ হয় ওদের বাড়ী গেছে। যা চঞ্চল মেয়ে! এক যায়গায় সুস্থ হয়ে বসে থাকতে তো পারে না।

হালদার—শৈলর গলা পাচ্ছিলাম যেন। সে কি ফিরেছে ?

সুরুচি—[ইঙ্গিতে] ফিরেছেন।

হালদার—এর মধ্যে ?

সুরুচি—আজ কলেজ বন্ধ। ছেলেরা নাকি ষ্ট্রাইক করেছে।

হালদার—এই দেখ! আমাদের রামেন্দু ?

সুরুচি—সেও আছে। শুনছি সেই নাকি রিং লিডার—পতাকা ওড়াচ্ছে, আর গান্ধীর জয়ধ্বনি করছে।

[চাকরে চা দিয়ে গেল।

হালদার—[চিন্তিতভাবে চা পান করতে করতে] দেখছ? কী যে দিনকাল পড়েছে! আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, ওই গান্ধীই ছেলেগুলোর মাথা না খেয়ে ছাড়বেন না।

[ঝড়ের মত কনক ও লিলির প্রবেশ।

কনক ও লিলি—শুনেছেন দাদু, কলেজের ছেলেরা ষ্ট্রাইক করেছে।

সুরুচি—[শৈলবিহারীর ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে] এই, আস্তে।

কনক—[স্বর নামিয়ে] বাবা ফিরেছেন নাকি?

লিলি—[চুপি চুপি] এমন সাকসেস্ফুল্ ষ্ট্রাইক হয়েছে! একটি ছেলেও ক্লাসে যায়নি। এই দুরন্ত রোদ। গেটের গোড়ায় এতটুকু ছায়া নেই। মাটি তেতে আগুন। তাতেই ছেলেরা শুয়ে আছে। দেখে এমন কষ্ট হচ্ছে!

সুরুচি—তুই দেখলি কি ক'রে?

কনক—আমরা গিয়েছিলাম যে!

সুরুচি—[হালদার সাহেবকে] শুনলেন তো? আমি ভাবলাম বুঝি ও-বাড়ী গেছে।

হালদার—কি চায় ওরা? মানে ছেলেরা?

কনক—ওদের একটি প্রোফেসারকে ছাড়াবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাঁকে ওরা রাখতে চায়।

হালদার—দাড়াও, দাড়াও। একি সেই প্রোফেসার যাঁর কথা ওরা প্রায়ই বলে ?

লিলি—হ্যাঁ, প্রোফেসার ঘোষ।

হালদার—এ আমি জানতাম। কিন্তু ওরা কি রাখবার মালিক যে রাখতে চাইছে ?

লিলি—[উত্তেজিত ভাবে] মালিক নয় বলেই তো ষ্ট্রাইক করতে হয়েছে। তাই তো এত দুঃখ সইছে।

হালদার—[সামনের বড় আয়নার দিকে চেয়ে তাঁর টাইটা ঠিক করে নিলেন।] তোমাদের দুঃখ সহার এই ফিলসফিটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। এ অনেকটা কাঁদুনী গাওয়ার মতো। কোন শক্তিমান জাতি তার নিজের দাবী মেটাবার জন্যে প্রতিপক্ষের সদর দরজায় না খেয়ে শুয়ে থাকতে লজ্জা বোধ করে।

কনক—[তীক্ষ্ণ কণ্ঠে] আপনাদের সময় এ রকম ক্ষেত্রে আপনারা কী করতেন বলুন তো ?

হালদার—বোধ হয় কিছুই করতাম না। কিম্বা সভা সমিতি করতাম এবং আমাদের অভিযোগের দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতাম।

কনক—তাতেও যদি কোনো ফল না হ'ত ?

হালদার—তা হলে বুঝতাম আর কিছুতেই ফল হবে না।

[কনক ও লিলি বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসলো।

হালদার—কিন্তু ওরা যদি পুলিশ আনে ?

লিলি—সে তো আনবেই।

হালদার—তবে? না, না, এসব তো ভালো কথা নয়। এসব কখনই ভালো কথা নয়।

[এমন সময় বাইরে বহু কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠলো। কনক ছুটে গিয়ে জানালার বাইরে চাইলে।

কনক—ছেলেরা মিছিল বের করেছে। বাইরে আসুন শীঘ্রি।

[ওরা সকলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রবীন্দ্রনাথের একখানি জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে মিছিলের প্রবেশ। সুরুচিও বাহিরে এসে দাঁড়ালেন।

সুরুচি—[উদ্বেগ-ব্যাকুল কণ্ঠে] রামেন্দু কোথায়? তাকে দেখছিনে তো? আমার রামেন্দু?

[মিছিল থেকে একটি ছেলে এগিয়ে এসে সুরুচির পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলো।

সুরুচি—রামেন্দু কোথায়? আমার রামেন্দু—

ছেলেটি—এই পতাকা রামেন্দু আমাদের দিয়ে গেছে মা। বলে গেছে, আমাদেরই একটি বোনের হাতে তৈরী এই পতাকা। এর মূল্য তাই অনেক। বলে গেছে, কিছুতেই এর মর্যাদা যেন আমরা ক্ষুণ্ণ না করি।

সুরুচি—কিন্তু সে কোথায়? রামেন্দু?

ছেলেটি—তাকে পুলিশে নিয়ে গেছে। তাকে, বিশ্বমোহনকে এবং আরও কয়েক জনকে।

কনক—পুলিশ এসেছিল?

ছেলেটী—হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত প্রিন্সিপ্যাল পুলিশকে খবর দেন। তারা এখন গেটে পাহারা দিচ্ছে।

[সকলে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একটা আশ্চর্য কঠিন নীরবতা সমস্ত স্থানটিকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

লিলি—[শান্ত কণ্ঠে] আমরা কি আপনাদের কোনো কাজে লাগতে পারি ?

বালকটি—[চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাড়িয়ে চিন্তিত ভাবে] বোধহয়, না। এ আমাদের নিজেদের সংগ্রাম। বাইরের লোকের এতে স্থান নেই। কিন্তু আপনাদের সহানুভূতি আমাদের চিরদিন মনে থাকবে।

[মিছিল চলে গেল। একটু পরে শুকচিত্ত।

কনক—আজ বনের ধারে বেড়াতে যাবেন না দাদু ভাই ?

হালদার—না, তোমরা যাও বরং।

[ওরা চলে গেল। হালদার সাহেব তাঁর নিজের ঘরে ফিরে এসে একখানা মোটা বই খুলে পড়তে বসলেন। একটু পরে শৈলবিহারী ঘরে এসে তাঁকে পড়তে দেখে ফিরে গেলেন। আবার তখনই ফিরে এসে একটু কাশলেন।

হালদার—শৈল ! এস, বস।

[শৈলবিহারী একখানা চেয়ার টেনে বসলেন]

হালদার—কিছু বলবে ?

শৈল—এদের কথাটা ভাবছিলাম।

হালদার—[দীর্ঘশ্বাস ফেলে] Very sad !

শৈল—এর চেয়ে আপনাদের আমলের ইংরেজী পোষাক পরিধান,

অখাদ্য ভোজন এবং অপেয় পানের মধ্যে আবেদনের নিবেদনের সাহায্যে ভারতের মুক্তি আনার যে স্বপ্ন চলছিল, তাও ছিল ভালো। তার মধ্যে দম্ভ ছিল, বিশ্বাস ছিল, অবশ্য কিছু পরিমাণ স্বেচ্ছাচারিতাও ছিল। কিন্তু এতো তা'নয়। এ যে একেবারে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কতকগুলো অপরিণত বয়স্ক ছেলেমেয়ের সর্ব্বনাশ ছাড়া আর কিছু যে এতে হবে, তাওতো মনে হয় না।

হালদার—কি জানি শৈল, এরা নতুন মানুষ। এদের নতুন মন, নতুন দৃষ্টি। আমার অবস্থা হয়েছে রিপ ভ্যান-উইঙ্কলের মতো। দীর্ঘকাল পরে ফিরে এসে সেই পুরোনো বাঙলাকে আর খুঁজে পাচ্ছি না।

শৈল—ভাবুন তো সে বাঙলা দেশের কথা, যখন এগার বছরের মেয়ে নাকে নোলক প'রে শ্বশুর বাড়ী যেত, যখন অশিক্ষিতা অবগুণ্ঠিতা গৃহস্থবধূ ভোর থেকে নিশীথ রাত্রি পর্যন্ত গৃহ কাজে ব্যস্ত থাকতো, সাধারণ লোকে যখন শাক-ভাতেই সন্তুষ্ট থেকে প্রবাসে যেতে চাইতো না। সে বাঙলা কোথায় গেল?

হালদার—আমাদের জীবনের কথা ভেবে দেখ শৈল। তখনকার চাল-চলন, তখনকার চিন্তাধারা, তার সম্বন্ধে আমার একটা মোহ আছে। তবু সেই ভালো কিম্বা এই ভালো, এই বিষয়ে আমি কিছুতেই নিঃসংশয় হতে পারছি না। একটা ঘূর্ণির মত উঠে রামেন্দু আমার চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিলে। তোমাকে

বলছি, এখনকার ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে আমার বিস্ময়ের আর শেষ নেই।

শৈল—কিন্তু তার ফল কি হচ্ছে?

হালদার—ফলের জন্যে এখনই ব্যস্ত হয়ো না। ব্যাপারটা বোঝ। ইংরেজী পোষাক প'রে আর ইংরেজী ভাষা শিখে আমরা ভেবেছিলাম, এবার আমরা সভ্য হয়েছি। আমাদের সাজসজ্জা দেখে, আমাদের মুখের চোস্ত ইংরেজী শুনে সাহেবরা এবার দয়া করে আমাদের দাসত্ব মোচন করে দেবেন। কিন্তু তাঁরা তা দিলেন না। তোমাদের মনে এর একটা প্রতিক্রিয়া হল। সাহেবীয়ানা থেকে তোমরা একেবারে ঘুরে দাঁড়ালে,—টিকি রাখলে, গীতা পড়লে, কেউ বৈজ্ঞানিক পন্থায় কেউ বা সনাতনী পন্থায় সাধন-ভজন সন্ধ্যা-আহ্নিকে মন দিলে।

শৈল—কিন্তু তাতে আর কিছু না হোক পারলৌকিক কল্যাণ হতে পারে। কিন্তু এ যে ইহলোক পরলোক কোন লোকেই···

হালদার—[বাধা দিয়ে] শোন। ইতিমধ্যে এল এরা। সমাজ মানে না, ধর্ম মানে না, দাম্পত্য সম্পর্কে পবিত্রতা পর্যন্ত স্বীকার করে না। কাউকে এরা আঘাত দেয় না, কেবল নিঃশব্দে উপেক্ষা করে যায়। এরাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে শৈল, এদেরই আমি বুঝতে পারছি না।

শৈল—ওদের বোঝা একটু শক্তই হয়েছে। কিন্তু সে বোধ হয় অন্য কারণে।

হালদার—কি কারণে ?

শৈল—এই কারণে যে, ওরা এদেশের নয়, রাশিয়ার। নদীর জলের সঙ্গে পুকুরের জলের মিল আছে। কিন্তু মদ স্বতন্ত্র জিনিষ। একমাত্র সাদৃশ্য ছাড়া স্বাদে গন্ধে কোথাও তার সঙ্গে জলের মিল নেই।

হালদার—বল কি ?

শৈল—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওরা আলোক-লতার মত দেশের বাতাসে ভাসছে। এ দেশের ঐতিহ্য, এ দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ওদের শিকড়ের যোগ নেই। এই আপনাকে বলে দিলাম। আমি এ পছন্দ করতে পারছি না।

[শৈলবিহারীর প্রস্থান। একটা প্যাকেট হাতে কনক ও লিলির প্রবেশ।

কনক—আপনার জন্যে একটা জিনিষ এনেছি দাদু।

হালদার—কি জিনিষ রে !

[কনক প্যাকেট খুলে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী বের করলে।

হালদার—এ কি করেছিস রে ! আমি মিহি ধুতিই পরতে পারি না, তাতে খদ্দর ? শুধু শুধু কতকগুলো টাকা আমার জন্যে নষ্ট করলি ভাই।

কনক—নষ্ট হবে কেন ? আপনি পরবেন যে।

হালদার—[ওদের শাড়ীর দিকে চেয়ে] তোদের জন্যেও কিনলি বুঝি ?

কনক—হ্যাঁ।

লিলি—ভাবলাম, আপনাকে খদ্দর পরাতে পারলে কি আনন্দই না হবে!

হালদার—[ম্লান হেসে] সখ করে একদিন পরাতে চাও পরিও, কিন্তু যে মন দিয়ে তোমরা খদ্দর পরেছ, সে মন আমি পাব কোথায়?

কনক—পাবেন নাই বা কেন? দেশ কি আমাদের একার?

হালদার—তবে কার?

কনক—আপনাদের নয়?

হালদার—না। আমাদের ভারতবর্ষ কবে ফুরিয়ে গেছে। এখন নতুন দেশ, নতুন যুগ, নতুন ধর্ম, নতুন মানুষের পালা। এর মধ্যে আমাদের ঠাঁই নেই।

লিলি—ঠাঁই করে নেওয়া যায় না?

হালদার—বোধ হয় না। দেশ মানে তো আর শুধু মাটি নয়—জল-হাওয়া, গিরি-নদী-বনও নয়—দেশ মানে একটা উপলব্ধি। আমাদের কালের উপলব্ধির সঙ্গে তোমাদের উপলব্ধির বনবেনা।

কনক—তা হলে থাক দাদু ভাই, আপনাকে আর খদ্দর প'রে কাজ নেই।

হালদার—অভিমান হ'ল?

কনক—অভিমান করিনি দাদু ভাই। আমরা জানি আপনি মিথ্যা বলেন না।

হালদার—[দাঁড়িয়ে উঠে ওদের দুজনকে দুবাহুর মধ্যে নিয়ে]
আমার সঙ্গে তোমাদের মতের মিল হ'ল না বলে দুঃখিত হয়ো না, কুণ্ঠিত হয়ো না। Absolute truth, চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। যুগে যুগে, দেশে দেশে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সত্যের রূপ কেবলই বদলেছে। এক পক্ষের সত্যের সঙ্গে আর পক্ষের সত্যের ক্রমাগত বেধেছে জেহাদ। কিন্তু তাতেও মীমাংসা হয়নি। সমষ্টির কথা ছেড়ে দাও আমার জীবনেই পরের পর সত্যকে কতবার যে রূপ বদলাতে দেখলাম তার ইয়ত্তা নেই। সকলের সঙ্গে সকলের সব জায়গায় মিল হবে, এ একটা অস্বাভাবিক আশা। আমাদের শুধু দেখ্‌তে হবে, মতের অমিলকে উপলক্ষ করে আমরা যেন পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে না ভুলি।

মধ্যেকার বড় বসবার ঘর। হালদার সাহেব একখানি সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

হালদার—ও ছোটমা।

[সুরুচির প্রবেশ।

সুরুচি—ডাকছেন বাবা ?

হালদার—ব্যাপার কি বলতো ?

সুরুচি—কিসের বাবা ?

হালদার—সকালে সেই যে আমার টেবিলে চা'টা নামিয়ে দিয়ে গেলে তারপরে আর দেখাটি নেই।

সুরুচি—রান্না করচি যে বাবা, তাই সময় পাইনি।

হালদার—কিন্তু তোমার মেয়ে তো আর রান্না করচে না, সেও তো ডুব মেরেছে।

সুরুচি—কোথায় গেল সে মুখপুড়ী ?

হালদার—মুখপুড়ীর দেখা না পাওয়া পর্যন্ত তো বলতে পারছি না। তাই ভাবছিলাম কি হলো তোমাদের ?

সুরুচি—কিছুই হয়নি বাবা। আমি দেখছি সে কোথায় গেল।

[গমনোদ্যত।

হালদার—শোন ! রামেন্দু বিশুর খবর কি ? আরও যাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদেরই বা খবর কি ?

সুরুচি—শুনচি তো সব ছাড়া পাবে।

হালদার—কি রকম ?

সুরুচি—ধর্মঘট মিটমাটের নাকি কথা হচ্ছে। বোধ হয় মিটমাট হয়েও যাবে। তখন ওরা মামলা তুলে নিতে পারে।

হালদার—প্রিন্সিপ্যালের মনের খবর কি ?

সুরুচি—শুনছি তাঁরও যথেষ্ট আগ্রহ আছে। ছেলেরা যে দুঃখ সয়েছে, তার কিছু কিছু তিনি নাকি নিজের চোখেই দেখেছেন. ছেলেদের তিনি তো কম ভালোবাসেন না। সে দৃশ্য দেখে তিনি নাকি চাকরি ছেড়ে দিতেই যাচ্ছিলেন। শুনতে পাচ্ছি মিটমাটে তাঁরই আগ্রহ নাকি সব চেয়ে বেশী।

হালদার—কি ভাবে মিটমাট হতে পারে তা কিছু শুনেছ ?

সুরুচি—মুস্কিল হয়েছে সেই প্রোফেসারকে নিয়ে। গভর্ণমেণ্টের জেদ তাঁকে তাড়াতেই হবে। ছেলেদের জেদ তাঁকে রাখতেই হবে।

হালদার—তা হলে ? তাঁকে বহাল রেখে তাড়ানো যায় কি ক'রে বুঝতে পারছি না তো ?

সুরুচি—ছেলেদের দুঃখ দেখে প্রোফেসারটি নিজেই নাকি চাকরি ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন।

হালদার—তারপরে ?

সুরুচি—ছেলেরা তাতেও নাকি রাজি নয়। তারা বলছে অন্ততঃ পূজো পর্যন্ত ওঁকে থাকতেই হবে। তার পরে উনি চাকরী ছেড়ে চলে যেতে পারেন।

হালদার—তাতে কি ওপক্ষ রাজী হবেন ?

সুরুচি—হতে পারেন।

হালদার—আচ্ছা, তুমি দেখতো—মেয়েটা কোথায় পালাল ?

[সুরুচির প্রস্থান।

লিলি—(নেপথ্যে) দাদু ভাই, কোথায় আপনি ?

হালদার—এই যে দিদি ভাই, এস।

[লিলির প্রবেশ।

লিলি—কনক কোথায় দাদু ?

হালদার—[গম্ভীর ভাবে] তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ হয় elope করেছে।

লিলি—কি রকম ?

হালদার—ছোটমা প্রথমে আমাকেই সন্দেহ করেছিলেন। তাই দেখা দিয়ে জানালাম আমি নই, আমি নই, অন্য কেহ, অন্য কোনোখানে।

লিলি—[চোখ টিপে] কাছেই কোথাও আছে।

হালদার—কে ? মেয়ে না জামাই ?

লিলি—জামাই তো জেলে।

হালদার—বিশু, না ? আমারও মাঝে মাঝে সেই সন্দেহ হয়েছে।

লিলি—কনককে খুঁজে দেখব নাকি ?

হালদার—দেখ দেখি খুঁজে। তোদের দুজনকে একঘণ্টা না দেখলে আমার মনটা কেমন হাঁপিয়ে ওঠে।

লিলি—ওরে বাবা, এযে গভীর প্রেম !

[কনক হাসতে হাসতে এল

কনক—কার দাদুভাই ?

হালদার—তোরই দিদি। ছিলি কোথায় ?

কনক—[লজ্জিত ভাবে] একটু পড়ছিলাম।

হালদার—একটু সামলে পড়িস ভাই। একেবারে যেন নিখোঁজ হোস না।

কনক—আহা নিখোঁজ আবার কি ? আমি তো ওই পাশের ঘরে পড়ছিলাম।

লিলি—দাদু বলছিলেন, elope করেছিস্।

কনক—দাদু ক্রমেই incorrigible হয়ে উঠছেন। ওঁকে আর ভদ্র করা গেল না।

হালদার—ও। আমারই বুঝি সব দোষ। আর লিলি যে বললে, জামাই যখন জেলে তখন তুই কাছেই কোথাও আছিস।

কনক—[লিলির চুলের মুঠি ধরে] বলেছিস ?

লিলি—[আর্তস্বরে] না, না মিথ্যে কথা।

কনক—দাঁড়াও, তোমার মজা দেখাচ্ছি।

[বেগে প্রস্থান।

হালদার—কোথায় আবার গেল ?

লিলি—কি জানি ?

[কনক একগাদা চিঠি নিয়ে এসে দাদুর কোলের ওপর ছুঁড়ে দিলে।

কনক—আর লিলির এই সব কীর্তি কাহিনী পড়ে দেখুন।

[লিলি ব্যস্তভাবে সেই সব চিঠি কেড়ে নিতে গেল। কিন্তু হালদার সাহেব তার কতকগুলো তখন পকেটে পুরে ফেলেছেন। আর বাকী গুলো নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কনক হাসতে লাগলো। নিরুপায় লজ্জিত লিলি ছুটে পালাল।

হালদার—কি এগুলো?

কনক—লিলির আর দাদার চিঠি।

হালদার—রামেন্দুর?

কনক—হ্যাঁ।

হালদার—বেশ আছিস তোরা।

[হাসতে হাসতে চিঠিগুলো ফিরিয়ে দিয়ে

তোরই কাছে রেখে দে। যখনই লিলি দুষ্টুমি করবে তখনই আমার হাতে একখানা করে দিবি। কিন্তু এ হ'ল কি? শৈলর মাথায় এক হাত টিকি! তোরা দুই ভাইবোনে তাকে না ডুবিয়ে ছাড়বি না দেখছি।

[এমন সময় রামেন্দু ও বিশ্বমোহন এসে হালদার সাহেবকে প্রণাম করলো।

হালদার—[চমকিত ভাবে] রামেন্দু! বিশু! থাক্ থাক্ আর প্রণাম করতে হবে না। এ যুগে প্রণাম অচল।

[ওদের দুজনকে হাত ধরে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

হালদার—আমরাও আশা করছিলাম, তোমরা আজকালের মধ্যে ছাড়া পাবে। কিন্তু এখনই যে আসবে তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু তোমাদের মিছিল কই? আমরা তো ভাবছিলাম ধুলো উড়িয়ে মিছিল করে সমস্ত শহরকে জানিয়ে তোমরা আসবে। কিন্তু এলে একেবারে চুপি চুপি দক্ষিণা বাতাসের মত? উঁ? এর জন্যেও আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। তারপর? ওরে রামেন্দু এসেছে, বিশু এসেছে। বস, তোমরা বস। কিন্তু অমন চেহারা হ'ল কেন? মাথার চুলে তেল নেই, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ ভিতরে ঢুকে গেছে···

[সুরুচির প্রবেশ, ওরা সুরুচিকে প্রণাম করলো।

রামেন্দু—তার আর আশ্চর্য কি? আমরা যে শ্বশুরবাড়ী যাইনি সেতো আপনি জানতেন!

হালদার—[অট্টহাস্যে] শ্বশুর বাড়ী! উঁ? তোরা আর শ্বশুর বাড়ীর কি দেখেছিস? সে ছিল আমাদের সময়। শালীরা কান মলে লাল করে দিত। আর কত রকমের যে ঠাট্টা! [অট্টহাস্যে] গাড়ুর মধ্যে গোবরের জল, বুঝলি? আর পানের মধ্যে আরশুলা; আর···ওকি! লিলি যে, আয় আয়।

[লিলির প্রবেশ।

লিলি—আপনার হাসির লহর শুনে এলাম দাদু ভাই। তোমরা কখন এলে বিশুদা?

হালদার—সেইটেই আসল কথা। আমার হাসির অপবাদ দিসনে।

রামেন্দুও এসেছে। তার দিকেও একটু প্রসন্ন দৃষ্টি ঝরুক।

[সুরুচির প্রস্থান।

হালদার—তোমরা কি জেল থেকে বেরিয়ে সোজা এখানেই আসছ ?

রামেন্দু ও বিশু—হ্যাঁ।

হালদার—আচ্ছা, তোমরা বস আমি আসছি।

[হালদার সাহেবের প্রস্থান। ওরা ঘনিষ্ঠ ভাবে বসলো।

কনক—অবস্থা ভালো নয়। তোমরা যে দাদুর বন্দুক নিয়ে নাড়া-চাড়া কর, সে কথাও পুলিশে টের পেয়েছে।

রামেন্দু—বলিস কি ?

কনক—হ্যাঁ। আমাকে এসে দুবার জিজ্ঞাসা করে গেছে।

রামেন্দু—আশ্চর্য নয়। একটা লোককে অনেকদিন থেকে এপাড়ায় ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। এখন বুঝতে পারছি সে কেন ওরকম করত।

কনক— } [সমস্বরে] কালো মতন ?
বিশু— } ছিপছিপে ?
লিলি— } মাথায় টাক্ ?

রামেন্দু—হ্যাঁ।

বিশু—পুলিশ আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি ?

কনক—প্রোফেসার ঘোষ এখানে আসেন কিনা তাও জিজ্ঞাসা করছিল।

[রামেন্দু ও বিশু পরস্পরের মুখের দিকে চাইলো।

বিশু—তারপর ?

লিলি—আর একটা কথা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল।

বিশু—কি কথা ?

লিলি—জিজ্ঞাসা করেছিল পতাকাটা আমার তৈরী কিনা। বললে আর কখনো ওরকম কোরো না। তোমরা খৃষ্টান, তোমরা কেন এসব স্বদেশীর মধ্যে আস ? তোমার কি মক্ষিরাণী হবার সখ হয়েছে ?

[লিলি মুখ নামিয়ে হাসলো।

রামেন্দু—তারপর ?

লিলি—বললে, তোমরা নিজেদের সর্বনাশ নিজেরা ডেকে আনছ। আমি যেন তার মধ্যে না যাই। আমি বিনীত ভাবে বললাম, বেশ। তারপর আমাকে অনেক উপদেশ দিলে। শেষে বললে, তোমরা শীঘ্রি ছাড়া পাবে। সে সময় যদি আমি তোমাদের ওপর নজর রাখতে পারি, তোমরা কি করছ, কোথায় যাচ্ছ, কে কে তোমাদের কাছে আসছে, এসব সন্ধান নিয়ে পুলিশকে জানাতে পারি, তা হলে আমার সুখ সমৃদ্ধি বাড়তে পারে।

[সকলে হো হো করে হেসে ফেললো।

রামেন্দু—তা হলে তোমার ভাবনা নেই।

লিলি—না। [একটু পরে] সে যাই হোক, ব্যাপার সুবিধা নয়। তোমাদের যে বেশী দিন বাইরে থাকতে দেবে মনে হয় না।

বিশু—হুঁ। আমারও মন ডাকছে, জেলের বাইরে বুঝি বেশি দিন থাকতে আসিনি। কিন্তু আমি এখন উঠলাম রামেন্দু।

রামেন্দু—[অন্যমনস্ক ভাবে] হ্যাঁ তুমি এস। বাড়ীতে সবাই উৎকণ্ঠিত আছেন।

[রামেন্দু একদৃষ্টে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো।

কনক—তোমার খাবার নিয়ে আসি দাদা!

[রামেন্দু আকাশের দিকেই চেয়ে রইলো। সাড়া দিলে না। কনক চলে গেল। লিলি আস্তে আস্তে এসে ওর কাঁধের ওপর একখানা হাত রাখলো। রামেন্দু চমকে উঠলো।

লিলি—কি ভাবছিলে?

রামেন্দু—ভাবছিলাম? সে অনেক কথা। বিশু চলে গেছে?

লিলি—অনেকক্ষণ।

রামেন্দু—তুমি যাওনি?

লিলি—যেতে বলছ তুমি?

রামেন্দু—[লিলির হাতখানা ধরে পাশে বসিয়ে] না, যেতে বলিনি। কিন্তু গেলেই বোধ হয় ভালো করতে।

লিলি - কি হতো? সুখ সমৃদ্ধি বাড়তো?

রামেন্দু—[হাসলো] না সে ইতরতা তোমার জন্যে কামনা করি

না। তবু বোধ হয় ভালোই করতে। কি হবে এর মধ্যে মিছে মিছি থেকে ?

লিলি—তাই তো !

[রামেন্দু আবার অন্যমনস্ক ভাবে আকাশের দিকে চাইলে।

লিলি—বারে বারে আকাশের দিকে চেয়ে কি দেখছো বলতো ?

রামেন্দু—বাস্তবিক ! জান লিলি, আকাশের জন্যে এই তৃষ্ণা বোধ করি জেল থেকেই নিয়ে এসেছি। যে ঘরটিতে থাকতাম তাতে জানালা ছিল না। উপরে কতকগুলো গবাক্ষ ছিল বটে, কিন্তু মেঝেয় দাঁড়িয়ে তার ভেতর দিয়ে বাইরে দৃষ্টি চলে না। দিনের পর দিন কেটেছে, যে সময়টুকু স্নানাদি কাজের জন্যে বাইরে আসতে পেতাম, তা ছাড়া আর কোনো সময়ের জন্যে আকাশ দেখতে পেতাম না। মানুষের মনে আকাশ যে এতখানি জায়গা জুড়ে আছে সেই প্রথম টের পেলাম।

[লিলি নিঃশব্দে ওর মাথার চুলে হাত বুলোতে লাগলো।

রামেন্দু—বিশু বোধ হয় ঠিক বলে গেল লিলি ! জেলের বাইরে বেশিদিন আমরা থাকতে আসিনি। বড় জোর দুটো তিনটে সপ্তাহ, কি একমাস, কি দুটো মাস। তারপর একদিন সুপ্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে দেখবো লাল পাগড়ী এসে বাড়ী ঘেরাও করেছে। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই গৃহসুখের মেয়াদ যাবে ফুরিয়ে। তারপর নিষ্ঠুর লাল রঙের উঁচু প্রাচীর

ঘুলঘুলিওয়ালা সেই ঘর, সঞ্চরমান বুটের সেই পরিমিত শব্দ, মনুষ্য সভ্যতার বাইরে যে এক স্বতন্ত্র জগৎ।

লিলি—কেন ভাবছ? জেল তোমার নাও তো হতে পারে।

রামেন্দু—(ম্লান হেসে) স্তোক দিওনা লিলি। তার চেয়ে তৈরী হয়ে থাকা ভালো। কিন্তু ভাবতো, রামেন্দু,—এত বড় বয়স পর্যন্ত রাত্রে একলা বাইরে যাওয়ার সাহস যার ছিল না,—বাঘ, ভাল্লুক, শিয়াল, ভূত প্রেত দৈত্যদানার ভয়ে যার মন নিদ্রাকালেও ভারাক্রান্ত থাকতো,—সেও উঠলো দুঃসাহসী হয়ে! গৃহের আরাম এবং নিশ্চিন্তে জীবন-যাপনের প্রয়োজন তারও গেল ফুরিয়ে!

লিলি—আমাদের সকলেরই জীবনে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায়ও নেই, ইচ্ছাও নেই।

রামেন্দু—আশ্চর্য! আমাদের গৃহবলিভুক অতীতের সঙ্গে এই সর্বনাশা বর্ত্তমানের একেবারেই কোনো যোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ যেন ঝড়, দক্ষিণা বায়ুর কোনো পরিচয় এর অঙ্গে নেই।

ঘোষ—[নেপথ্যে] রামেন্দু আছ!

রামেন্দু—প্রোফেসার ঘোষ। তুমি ভেতরে যাও লিলি! আসুন স্যার!

[ঘোষের প্রবেশ। রামেন্দু তাঁকে প্রণাম করলো।

ঘোষ—কতক্ষণ এসেছ!

রামেন্দু—এই আধ-ঘণ্টা হল স্যার !

ঘোষ—তোমার বাবা কোথায় ?

রামেন্দু—পূজোয় বসেছেন।

ঘোষ—এ ঘরে নিরিবিলি কথা বলা যায় ?

রামেন্দু—বলুন।

ঘোষ—তোমরা শোনোনি বোধ হয়, আমি চাকরী ছেড়ে দিলাম।

রামেন্দু—ছেড়ে দিলেন ! কেন ? গোলমাল তো সব···

ঘোষ—মিটে গেছে। অর্থাৎ আমাকে বরখাস্ত করার যে নোটিস্ দেওয়া হয়েছিল তা তুলে নেওয়া হয়েছে। সত্যি। কিন্তু আমি এখানে কি শুধু চাকরী করতেই এসেছিলাম ?

রামেন্দু—না।

ঘোষ—[হাসলেন] যে উদ্দেশ্যে এসেছিলাম, ত পূর্ণ হয়েছে। তোমাদের তৈরী করেছি। এখানকার কাজের ভার এখন তোমরাই নিতে পারবে। সেদিক দিয়ে আমার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। বরখাস্তের গ্লানিও আর নেই। এখন স্বচ্ছন্দে আমি যেতে পারি। ডাকলেই যাতে পাও, তার ব্যবস্থাও করে যাচ্ছি। এই কথাটাই বলতে এসেছিলাম। তোমার বাবা পুজো করুন, আমি ততক্ষণ তোমার দাদুর সঙ্গে একটু আলাপ করি। যাবার সময় আবার তোমার বাবার হাত ধরেই বেরুতে হবে কিনা !

[আশ্চর্য ভঙ্গিতে হাসলেন।

রামেন্দু—কেন ?

ঘোষ—মোড়ের মাথায় সেই টেকো ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তার জানা দরকার যে আমি তোমার কাছে আসিনি, তোমার বাবার কাছে এসেছিলাম।

রামেন্দু—আমি ডেকে আনছি দাদুকে।

[প্রস্থান এবং হালদার সাহেবকে নিয়ে প্রবেশ।

হালদার—[আগ্রহের সঙ্গে ঘোষের শেকৃহ্যাণ্ড করে] আপনি প্রোফেসার ঘোষ? আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম যে! আমার সাহেবী পোষাক দেখে ভয় পাবেন না। বসুন। Do you smoke?

ঘোষ—না। ধন্যবাদ। কিন্তু এত লোক থাকতে আমাকে আপনি খুঁজছিলেন কেন বলুনতো?

হালদার—[একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে] Professor, I have got to know you. আপনাদের আমি জানতে চাই। আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার। আপনি দয়া করে··

ঘোষ—তার আগে আপনি দয়া করে আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমার নাম আলোক ঘোষ।

হালদার—Good. আলোক, এত লোক থাকতে তোমাকেই আমার বিশেষ প্রয়োজন। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। একদিন নয়, অনেক দিন। কথা কি জানো, আমি তোমাদের বুঝতে পারছি না। তার জন্যে বড় কষ্ট হচ্ছে। তুমি জাননা বোধ হয়, আমি দীর্ঘদিন বাঙলার সঙ্গে সম্পর্কহীন। এতকাল পরে ফিরে এসে কিছুই বুঝতে

পারছি না। নিজের পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি নাতিনী সব অপরিচিত ঠেকছে। এদের মধ্যে থাকতে গেলে এদের তো সব চেনা দরকার। দেবে তো চিনিয়ে?

ঘোষ—আমি চিনিয়ে দেবো? আপনার চোখে কিছুইতো এড়াবার কথা নয়।

হালদার—হয়তো নয়। কিন্তু আমারও ক্রটী আছে। আমি বুদ্ধি দিয়ে তোমাদের জানতে চাইছি। সেইটাই ভুল হচ্ছে, বুদ্ধি দিয়ে কাকেও পুরোপুরি জানা যায় না। অথচ আমার উনবিংশ শতাব্দীর মন তার পুরোনো সংস্কার নিয়ে কিছুতে তোমাদের সঙ্গে মিলতে পারছে না। আমার কষ্ট হচ্ছে তাই। [হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসে] মুস্কিল কি জান? শৈলবিহারী মাথায় টিকি রাখেন, সন্ধ্যা আহ্নিক করেন, আগে খদ্দর পরতেন এখন পরেন না। ওদের আমি বুঝতে পারি, কিন্তু এদের সঙ্গে মিলতে পারি না। আর তোমাদের সঙ্গে মিলতে পারি, কিন্তু তোমাদের বুঝতে পারি না। আশ্চর্য!

ঘোষ—[নিরুত্তর]

হালদার—আচ্ছা, তোমরা কি চাও বলতো?

ঘোষ—ভারতের মুক্তি।

হালদার—মুক্তি? সে তো আমরাও চেয়েছিলাম।

[ঘোষ হাসলেন।

হালদার—'বন্দেমাতরম' আমরাই তোমাদের দিয়েছি, স্বীকার কর?

ঘোষ—[হাসিয়া] কেন করব না ?

হালদার—কিন্তু তোমাদের এ অস্ত্র 'বন্দেমাতরম', তা স্বীকার কর ?

ঘোষ—করি বইকি। কিন্তু সেই সঙ্গে আপনাকেও স্বীকার করতে হবে, যে মুক্তি আমরা চাই তা আপনারা চাননি। হয়ত আপনাদের কল্পনাতেও তা ছিল না। সর্বমানবের স্বাধীনতা, —চেয়েছিলেন তা ? কল্পনা করেছিলেন কি ?

হালদার—[চিন্তিতভাবে] সেটা কি বস্তু, বল তো ? তার মানে গণতন্ত্র তো ?

ঘোষ—তারও বেশী। তার মানে শুধু হিন্দুর কিম্বা মুসলমানের স্বাধীনতা নয়, জমীদার কিম্বা পুঁজিপতির স্বাধীনতা নয়, অথবা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শাসনও নয়।

হালদার—তবে ?

ঘোষ—ওইতো বললাম, তার মানে সর্বমানবের স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা শুধু আমাদের রাজনৈতিক মুক্তিই আনবে না, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যও দূর করবে।

হালদার—[অনেকক্ষণ নিঃশব্দে থেকে ধীরে ধীরে] তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না। আমি তোমাদের বুঝতে চাই। তোমার কথা আমি ভালো করে বুঝে দেখব। মাঝে মাঝে তুমি আসবে তো ?

ঘোষ—আসব যে কদিন আছি।

হালদার—তুমি কি বাইরে কোথাও যাচ্ছ ?

ঘোষ—ইচ্ছা আছে।

হালদার—[একমুহূর্ত বাহিরের দিকে চেয়ে থাকলেন] আমারও ইচ্ছা করে এই বাঙলাদেশটাকে একবার ঘুরে ঘুরে ভাল করে দেখে আসি। কিন্তু সাহস পাইনা। সে বয়স আর নেই। সে শক্তিও নেই।

রামেন্দু—[বাইরে থেকে ঘুরে এসে] বাবার আহ্নিক শেষ হয়েছে।

ঘোষ—হয়েছে? আচ্ছা তাহলে…

[হালদার সাহেবের পায়ের ধুলো নিলেন।

হালদার—এত শীঘ্র তোমাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা ছিল না। তবু তোমাকে ফিরে ডাকবো না। অতীতকালের কাছে বর্তমানের যে ঋণ আছে, সেই ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে যাবার জন্যেও একবার তোমাকে আসতে হবে। এ বিশ্বাস আমার আছে।

রামেন্দু—[দ্বারপ্রান্তে গিয়ে] কেমন দেখলেন স্যার?

ঘোষ—Wonderful, ওঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই আমার কানে এসেছে; হয়ত অতিরঞ্জিত হয়েই। তবু এমনটি প্রত্যাশা করিনি রামেন্দু। ওই প্রশস্ত ললাট, ঋজু নাসিকা, দীর্ঘচ্ছন্দ মুখের ডৌল এবং গম্ভীর কণ্ঠস্বরে—এমন একটি বুদ্ধির অভিজাত্য আছে, যা মুহূর্তে মানুষকে অভিভূত করে। পর্বতের কাছে গেলে যে রকম নিজেকে বড় ছোট মনে হয়

এঁর কাছে এলেও তেমনি একটা অনুভূতি আসে। অথচ মনে কোথাও গ্লানি জমে না।

[ওরা চলে গেলে হালদার সাহেব তাঁর চেয়ারে বসে একখানি ইংরেজী বই পড়তে লাগলেন। লিলি চুপি চুপি এসে তাঁর পাশের একটা চেয়ারে বসলো। হালদার সাহেব চশমাটা বাঁ হাত দিয়ে খুলে, তার মুখের দিকে সকৌতুকে চাইলেন।

হালদার—কি খবর ?

লিলি—[ঠোঁট উল্‌টে] ভালো নয়।

হালদার—কেন ?

লিলি—বিশ্রী লাগছে।

হালদার—সে আবার কি ? রামেন্দু কি…

লিলি—[মাথা ঝাঁকি দিয়ে] তার জন্যে নয়, আপনার জন্যে।

হালদার—[কৃত্রিম বিস্ময়ে] মানে ? রামেন্দুর কপাল কি তবে ভাঙলো ?

লিলি—জানিনা যান। শুনুন, আপনার কি হয়েছে বলুন তো ?

হালদার—কিছুই হয়নি তো !

লিলি—বাইরে বেরুনো ছেড়ে দিয়েছেন। কবিতা আর বলেন না। যখনই আসি দেখি, হয় খবরের কাগজে মুখ ঢেকে বসে আছেন, নয় তো ওয়েল্‌স আর হাক্সলী।

হালদার—ওঁদের মারফৎ তোদের বোঝবার চেষ্টা করছি যে !

লিলি—[ঝাঁঝের সঙ্গে] বোঝবার চেষ্টা করছেন ! কিন্তু ওঁরা আমাদের সম্বন্ধে কি জানেন ?

হালদার—বলিস কি? আমি তো শুনেছি, ওঁরাই তো তোদের সম্বন্ধে সমস্ত জানেন।

লিলি—কিছু জানেন না। ওঁরা বলবেন, গেল দুশো বছরে দেশ দু-ইঞ্চি পিছিয়েছে, আগামী দুশো বছরে আশা করা যাচ্ছে… সব মিথ্যা কথা। এ যেন আবহাওয়া তত্ত্বের নম্র! [হাসলে]

[ইতিমধ্যে কনক যে কখন হালদার সাহেবের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ টের পায়নি।

কনক—তুই কি তবে বলতে চাস যুগে যুগে মানুষের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না?

লিলি—কিছুমাত্র না। পরিবর্তন যা হচ্ছে সে মানুষের বাইরের খোলসের। ভিতরের মানুষটি তেমনি আদিম আছে। তার স্নেহ-মায়া ভালোবাসা, তার লোভ-লালসা হিংসা, তার নির্লজ্জতা-নিষ্ঠুরতা-কাপুরুষতা কিছুরই কি বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়েছে মনে হয়?

কনক—কিন্তু…

লিলি—কিন্তু নয়। চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলঙ্গ আজও আছে। কেবল তফাৎ এই যে তারা আজকাল হস্তী-অশ্বে চড়ে আসেনা। আসে এরোপ্লেনে চড়ে, মেকানাইজড্ বাহিনী নিয়ে। বর্গীর আক্রমণ কালে মৃত শিশু কোলে নিয়ে অসহায় জননী যেমন করে কেঁদেছে, এই বিংশ শতাব্দীর বিমান আক্রমণকালেও মায়েরা কি তেমনি করেই কাঁদেনা? তফাৎটা কোথায়?

হালদার—তফাৎ আছে।

লিলি—তফাৎ নেই। আপনি ইংরেজী পোষাক পরেন, এখানকার বাঙালী নিতান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্র ছাড়া তা প'রে না। কিন্তু নেপালের শৈলশিখরে যেমন করে আপনি হৃদয় নিবেদন করেছিলেন, একালে কি তার কোনো ব্যতিক্রম হয়েছে মনে করেন?

হালদার—[হেসে] সে ভাই তোরা জানিস। আর সাহস দিলে আমিও না হয় একবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের চেষ্টা করতে পারি।

লিলি—[হেসে] ক্ষোভ রেখে কাজ কি? আপনাকে অভয় দিলাম। কিন্তু বেড়ান কি একেবারেই ছেড়ে দিলেন? আমাদের ছুটি কবে ফুরিয়েছে, শুধু এদের এই সব হাঙ্গামে যাই-যাই করে যাওয়া হচ্ছেনা।

কনক—ভালো কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিস লিলি! আপনার কি কথা ছিল দাদু ভাই?

হালদার—কি কথা ছিল মনে পড়ছে না তো।

কনক—এমনিই আপনার মন বটে! কলকাতায় বাসা করবার কথা ছিল না?

হালদার—বাস্তবিক! ভুলেই গিয়েছিলাম।

লিলি—[হালদার সাহেবের আঙ্গুলে একটা ঝাঁকি দিয়ে] ও, গোপনে গোপনে এই সব মতলব হয়েছিল? আর আমি বাদ বুঝি?

হালদার—তুমিই বা বাদ যাবে কেন দিদি? তুমিও থাকবে।

নৈলে আনন্দ হবে কেন? সত্যি, এখানটাই আমার আর ভালো লাগছে না।

কনক—কেন?

হালদার—কেন? ঘরের ছেলে জেলে যাচ্ছে। তাদের মাথায় পড়ছে লাঠি। হরতাল, ধর্মঘট, মিছিল। এরই মধ্যে আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছি। নিশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে।

কনক—কোন দিকে বাড়ী নেবেন?

হালদার—যেদিকে একটু ফাঁকা আছে। ভীড় আমি সইতে পারি না।

লিলি—বালীগঞ্জের দিকে নেবেন?

হালদার—মন্দ কি?

কনক—কিন্তু দূর হবে যে! আমাদের অসুবিধা হবে না?

হালদার—কিছুমাত্র না। আমার অনেকগুলি টাকা ব্যাঙ্কে পচছে। ভাবছি মরবার আগে সেগুলোর সদ্গতি ক'রে যাব। কলকাতায় গিয়েই একখানা মোটর কিনবো।

কনক—মোটর!

লিলি—সত্যি দাদু! মোটর কিনবেন?

হালদার—নিশ্চয়। বিকেলে আমরা তিনজনে যাব বেড়াতে। কখনও লেকে, কখনও গড়ের মাঠে, কখনও যাব বাইরে কোথাও। চাঁদিনী রাত্রে ছাদে বসবে সভা। একটু কবিতা পড়া হবে। একটু গান হবে। একটু বা গল্প হবে। বালীগঞ্জের সেই মর্তাভূমিতে আমরা তিনজনে মিলে একটা নতুন স্বর্গ রচনা করব! কি বলিস?

কনক—নিশ্চয়ই।

লিলি—আচ্ছা দাদুভাই! সেই আলোঝলমল ছাদে হঠাৎ যদি আপনার নেপালের সেই প্রিয়া আকাশ থেকে একবিন্দু বৃষ্টির মতো পিছলে নেমে আসে?

হালদার—Seleneর মতো? Naked in my arms? আঃ! স্বর্গটা কিসের তৈরী তোদের ধারণা আছে?

কনক—না।

হালদার—স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। মাটি নয়, জল নয়, পাথর নয়—শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ পেঁজা তুলোর মতো স্বপ্নের হালকা মেঘ দিয়ে তৈরী। তাকে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না, কিন্তু কল্পনার চোখ দিয়ে দেখা যায়। সেখানে বস্তু নেই, তাই ভার নেই, মৃত্যুও নেই।

কনক—আর দেবতারা?

হালদার—তাঁরাও স্বপ্ন। বাস্তবতার অসুর যুগে যুগে তাঁদের স্বর্গভূমি আক্রমণ করেছে। বিজ্ঞান বারে বারে তাঁদের মর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ফল কি হয়েছে? আমরা দেখেছি, পরবর্তী অসুর পূর্ববর্তীদের অতিক্রম ক'রে গেছে। এক যুগের বিজ্ঞান আগের যুগের বিজ্ঞানকে উপহাস করেছে। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির স্রোতরেখা মাঝে মাঝে অন্ধকারে গেছে হারিয়ে। কিন্তু স্বপ্নের স্বর্গ আজও অম্লান, আজও যেমন দূরে তেমনি দূরেই রয়েছে।

কনক—আপনি দেখবেন, বিজ্ঞানের জোরেই এই স্বর্গও মানুষ একদিন জয় করবে।

হালদার—মানব সভ্যতার জীবনে তত বড় দুর্দিন আমি কল্পনাও করি না। আমি জানি আমার উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গরচনার আনন্দের অবসান হয়েছে। তোদের শতাব্দী সেই স্বর্গলোক থেকে ভ্রষ্ট হয়ে এই পৃথিবীর ছোট ছোট দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। সেখানে নারী-মাংসের দুর্গন্ধ, শকুনি-গৃধিনীর কলরব, আর ট্যাকে টাকা না থাকার অভিযোগ। তবু স্বর্গ থাকবে এবং এই পৃথিবীর শ্মশানঘাট থেকে মানুষ সেই অদৃশ্যপ্রায় স্বর্গলোকের জন্যেই দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

[বলতে বলতে হালদার সাহেব অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কনক ও লিলি ওঁর দু-পাশে গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো। একটা নীল আলো ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো, এবং ক্রমেই গাঢ়তর হতে লাগলো।

কনক—সন্ধ্যা হয়ে আসছে দাদু!

হালদার—[অন্যমনস্ক ভাবে] হুঁ।

হালদার সাহেবের কলকাতার বাসা। ঘেরা বারান্দার মাঝখানে একটা টিপয়। চারিদিকে কয়েকখানি চেয়ার। পিছন দিয়ে দোতলায় যাওয়ার সিঁড় উঠেছে। হালদার সাহেব একা বসে বই পড়ছিলেন। মোটরের হর্নের শব্দে মুখ তুলে বাইরের দিকে চাইলেন। একটু পরেই কনক, লিলি ও জ্ঞানেন্দ্র প্রবেশ করলো। তিনজনের মুখই রক্ত-বর্ণ। ঘন ঘন রুমালে মুখ মুছছে। কনক ও লিলির চুল অবিন্যস্ত। তারা এখনও হাঁপাচ্ছে। পাশের দুখানা চেয়ারে তারা যেন ভেঙ্গে পড়ল। জ্ঞানেন্দ্র ব্যস্তভাবে পাখার রেগুলেটার খুঁজছে।

হালদার—কি ব্যাপার! এই রৌদ্রে কোথায় বেরিয়েছিলে?

লিলি—[হাঁপাতে হাঁপাতে] ভীষণ একটা…

হালদার—Accident?

লিলি—ভীষণ একটা অ্যাডভেঞ্চার দাদু ভাই! উঃ কি থ্রিল!

হালদার—[সন্দিগ্ধভাবে ওদের তিনজনের দিকে চেয়ে সভয়ে] প্রেম ট্রেম নয়তো?

লিলি—[অপাঙ্গে কনকের এলায়িত দেহের দিকে দ্রুত চেয়ে নিয়ে] নাঃ!

হালদার—কি তবে?

কনক—মিঃ মুকার্জীর কাছে মোটর ড্রাইভিং শিখছি দাদু ভাই।

হালদার—তাই বল। শিখলি কিছু? না রোদে ঘোরাই সার?

জ্ঞানেন্দ্র – [একটা সিগারেট ধরিয়ে] অনেকখানি। বোধকরি

সাতদিনের বেশী লাগবে না। ওরা দু-জনে এমন intelligent আর এত smart !

হালদার—[বিদ্রূপের সঙ্গে] হুঁ !

জ্ঞানেন্দ্র—সাতদিনের মধ্যে আপনাকে নিয়ে ওরা মোটরে বেড়াতে পারবে।

হালদার—না, না, বুড়ো মানুষের ওপর দিয়ে হাত পাকান চলবে না ভাই। ওদের হাতে আত্মসমর্পণ করার মত আনাড়ী আমি নই।

কনক—[ঠোঁট উলটে] আমরাও প্রথম চোটে বুড়ো মেরে খুনের দায়ে পড়তে রাজী নই।

হালদার—Good. আগে তাজা ছোকরাদের মেরে হাত পাকাও, তারপর আমিতো 'হাতের পাঁচ' আছিই। কি বল জ্ঞান ?

জ্ঞানেন্দ্র—নিশ্চয়ই।

[সকলে উচ্চহাস্য।

জ্ঞানেন্দ্র—[অপ্রস্তুত ভাবে] কি হল ? আমি কি কিছু বেফাঁস বলেছি ? কি জানি, আপনার কথাটা আমি ঠিক শুনিনি মিঃ হালদার। আমার স্বভাবটা এত অন্যমনস্ক ধরণের যে...

কনক—[নিজের রিষ্টওয়াচের দিকে চেয়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো] আপনার চা খাওয়া তো হয়নি দাদুভাই ?

হালদার—কি করে হবে ?

কনক—কি সর্বনাশ !

[কনক উপরে উঠতে যাবে জ্ঞানেন্দ্র সামনে এসে দাঁড়াল।

জ্ঞানেন্দ্র—[সবিনয়ে] আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি মিস্ হালদার ?

কনক—আসুন না।

[ওদের দুজনে প্রস্থান।

হালদার—কি ব্যাপার বলতো ?

লিলি—কিসের ?

হালদার—[চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে] ওদের ! প্রেম নয় তো ? বড় বেশি obliging মনে হচ্ছে যেন !

লিলি—[খিল খিল করে হেসে) দাদু যেন কী ! Young man, একটু obliging হবে না ?

হালদার—তার মানে ভয় নেই তো ?

লিলি—[উচ্চহাস্যে] তা আমি কি করে জানবো ?

হালদার—ওই তো। তোদের ওই হাসিটা বড় সর্বনেশে—ওকেই আমার ভয়।

লিলি—চুপ করুন। ওরা আসছে।

[একখানা চিঠি হাতে কনক ও তার পিছনে জ্ঞানেন্দ্র নীচে নেমে এল।

কনক—চা আসছে। আপনার একখানা চিঠি এসেছিল দাদুভাই। তখন ঘুমুচ্ছিলেন বলে দিইনি।

হালদার—কার চিঠি ?

কনক—বাবার হাতে লেখা মনে হচ্ছে।

হালদার—[চিঠিখানা খুলতে খুলতে] সে তো কখনও আমাকে নিজের হাতে চিঠি লেখে না। [চিঠি পড়তে পড়তে হালদার কাঁপতে লাগলেন] রামেন্দু গ্রেপ্তার হয়েছে !

কনক ও লিলি } [শান্ত কণ্ঠে] ও !

[ওরা দুজনে চিঠি খানা পড়লে।

কনক—আজকেই বাবা মা'কে নিয়ে এখানে চলে আসছেন।

হালদার—[বিচলিত ভাবে] কিন্তু তার আগে একজন ভালো উকিল তো দিতে হয়।

লিলি কনক } —উকিল ?

হালদার—নয় তো একজন ভালো ব্যারিষ্টার এখান থেকে নিয়ে যাওয়া যায় না ?

[কনক ও লিলি হাসলে।

কনক—উকিল, ব্যারিষ্টার কিছুতেই কুলোবেনা দাদুভাই। ওকে অর্ডিন্যান্সে ধরেছে।

হালদার—সেটা কি ?

লিলি—সে একটা আইন, যার ফলে বন্দীকে বিনা বিচারেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটক থাকতে হবে।

হালদার—অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ?

জ্ঞানেন্দ্র—তাই। কালও ছাড়া পেতে পারে, আবার ইহ জীবনেও ছাড়া না পেতে পারে।

হালদার—[বিব্রতভাবে] তা হলে ?

কনক—[সান্ত্বনার সুরে] আমাদের কিছুই করবার নেই দাদু। আমরা শুধু নিঃশব্দে তার ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে পারি।

হালদার—কিন্তু সে যে কবে ফিরে আসবে তাও তো বলতে পারছিস না!

কনক—না।

লিলি—দুঃখ করছেন দাদু, কিন্তু আমরা তো জানি সে একেবারে নির্দোষ নয়। যারা গভর্নমেণ্টের উচ্ছেদের জন্যে চেষ্টা করবে, প্রত্যুত্তরে গভর্নমেণ্ট তাদের কিছুই করবে না, এতো আর আমরা সত্যিই আশা করতে পারি না।

হালদার—তা পারি না।

লিলি—তবে ? যারা যাবে তারা শাস্তির জন্যে প্রস্তুত হয়েই যাবে। স্বাধীনতা চাইবে, অথচ তার মূল্য দেবেনা, এমন হয় না।

[হালদার নত দৃষ্টিতে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

কনক—নিজের নাতীটির জন্যে চিন্তিত হয়েছেন। কিন্তু ভারতের কত ছেলে যে এমনি করে জেলে আছে ভেবে দেখুন তো ?

হালদার—তোদের কষ্ট হচ্ছে না ?

কনক—কষ্ট ? [একটা ঢোক গিলে] কষ্ট হবে না ? কিন্তু দুঃখ করি না দাদু, কারও বিরুদ্ধে অভিযোগও করিনা।

লিলি—আমরা নিঃশব্দে আমাদের প্রাপ্য মাথায় তুলে নেব।

হালদার—কিন্তু শৈল ভয়ানক কাতর হয়েছে মনে হয়।

কনক—হবারই কথা। দাদার সম্বন্ধে তিনি যা'ই হোক-একটা কল্পনা করে রেখেছিলেন। দাদা পড়াশুনায় ভালো। এম্-এ তে ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। তারপর কোনো একটা কলেজে প্রোফেসারী নিয়ে বিয়ে থা করে হয় তো সকলের আনন্দবর্ধন করতে পারতো। এমন একটা মধুর কল্পনা ভেঙে গেলে সকল বাপ মা'রই দুঃখ হয়।

জ্ঞানেন্দ্র—[তার চেয়ারটা একটু আগিয়ে এনে] Excuse me, যিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন, তিনি কে ?

লিলি—কনকের দাদা।

জ্ঞানেন্দ্র—[অস্ফুট] ও ! [একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে] এতক্ষণে ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'ল।

[ওরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জ্ঞানেন্দ্রর দিকে চাইলে।

জ্ঞানেন্দ্র—কদিন আগে পুলিশ আমাকে অনেক প্রশ্ন করে গেছে। কেন আমি এখানে আসি, আপনাদের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, কতদিনের আলাপ, এখানে কি আলোচনা হয়, এই সব নানা রকমের প্রশ্ন। আমার এখানে আসার সঙ্গে পুলিশের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ভেবেই পাচ্ছিলাম না। এখন বুঝলাম সন্দেহটা কোথায়।

[ম্লান হাস্য।

কনক—[ব্যাকুল ভাবে] আপনি আর এখানে আসবেন না, মিঃ মুকার্জ্জী।

জ্ঞানেন্দ্র—[উপেক্ষা ভরে] কেন ? পুলিশের ভয়ে ?

কনক—তাই যদি হয় সে কি উপেক্ষা করবার ?

জ্ঞানেন্দ্র—আমি উপেক্ষাও করবো না, গ্রাহ্যও করবো না মিস্ হালদার ! আমি জানি, আমি নিরপরাধ। যতক্ষণ সে ধারণা আমার থাকবে, ততক্ষণ পুলিশ চায় না বলেই আমি এখানে আসা বন্ধ করতে পারি না।

কনক—তাতে আপনি সান্ত্বনা পেতে পারেন. কিন্তু পুলিশের কর্ত্তব্য শেষ হবে না। সত্যিই তো, আপনি এখানে কেন আসেন ?

জ্ঞানেন্দ্র—কেন আসি ?

কনক—হ্যাঁ, কেন আসেন ? আপনি আমাদের আত্মীয় নন। দীর্ঘকালের পরিচিতও নন। পুলিশ তো সন্দেহ করতেই পারে।

জ্ঞানেন্দ্র—তাই বলে আমি এখানে আসবো না ?

হালদার—আঃ ! কনক !

কনক—না, আসবেন না। কিসের জন্য আসবেন ? লিলি ? সে আপনাদের বাড়ীতে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে আসবে ?

জ্ঞানেন্দ্র—শুধু লিলি ?

কনক—শুধু লিলি। এখানে আর কে আপনার আত্মীয় আছেন ?

জ্ঞানেন্দ্র—কেউ নেই ?

কনক—কেউ নেই।

জ্ঞানেন্দ্র—[হাত বাড়িয়ে টুপিটা নিয়ে] উত্তম, মিস হালদার। এ

জীবনে আপনাদের বাড়ীর চৌকাঠ আর পার হব না।
নমস্কার, মিঃ হালদার!

হালদার—[বিব্রত ভাবে] ওকি, তুমি উঠলে যে?

জ্ঞানেন্দ্র—[শুষ্ক হাস্যে] আজ্ঞে হ্যাঁ। তুমি মাঝে মাঝে যেও লিলি। তুমি তো আমাদের আত্মীয়া। তোমার সঙ্গে তো অনেক দিনের পরিচয়। Good bye!

[কনক এসে জ্ঞানেন্দ্রের পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

কনক—এক মিনিট মিঃ মুকার্জ্জী। একটু চা খেয়ে যেতে হবে। এসে পর্যন্ত অপমান ছাড়া কিছুই আপনি পাননি।

জ্ঞানেন্দ্র—ধন্যবাদ, মিস্ হালদার। সেটা যে বুঝতে পেরেছেন তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। চায়ের আবশ্যক নেই। নমস্কার।

[প্রস্থান।

হালদার—এটা কি হ'ল কনক?

কনক—কোনটা দাদুভাই?

হালদার—এই যে একজন ভদ্র সন্তানকে বাড়ী থেকে বার করে দিলে? তাকে আর এ বাড়ী আসতে নিষেধ করে দিলে?

কনক—বার করে তো দিইনি দাদুভাই। অন্য যেটা করেছি, তাতে ভদ্র সন্তানের উপকারই হবে।

হালদার—উপকারটা কি অন্য ভাবে করা যেত না?

কনক—বোধ হয় না, দাদুভাই। কিন্তু [হাত ঘড়ি দেখে]

বাবাদের ট্রেন আসবার আর বেশি দেরী নেই দাদু। আমি কি গাড়ীখানা নিয়ে ষ্টেশনে যাব ?

হালদার। যাও।

[কনক চলে গেল। হালদার সাহেব নত-নেত্রে কি যেন ভাবতে লাগলেন। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে লিলি তাঁর একখানা হাত নিজের হাতে র মধ্যে তুলে নিলে।

লিলি—[স্নিগ্ধ কণ্ঠে] দাদুভাই !

হালদার—[নিঃশব্দে ওর দিকে চাইলেন।]

লিলি—চলুন আমরা আজ বিকেলে জ্ঞান্‌দা'র ওখানে যাই।

হালদার—কি হবে গিয়ে ?

লিলি—ওকে ধরে নিয়ে আসবো।

হালদার—[হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে] ও কিছুতেই আসবে না।

লিলি—যদি কনককে সুদ্ধ নিয়ে যাই ?

হালদার—সে কিছুতেই যাবে না।

লিলি—[একটু ভেবে] আশ্চর্য দাদুভাই ! বলতে পারেন, কনকের মতো এমন শান্ত মেয়ে কেনই যে এমন ব্যবহার করলে ? আর জ্ঞান্‌দা'র মতো একজন নিরীহ লোকই বা কেন এমন কঠোর ভাবে তা নিলে ? কনক কি জ্ঞান্‌দা'কে পুলিশের দৃষ্টি এবং তার অনিবার্য ফল থেকে বাঁচাবার জন্যেই এই রূঢ়তা দেখালে ?

হালদার—অন্য সময়ে শান্তভাবে বুঝিয়ে দিলেও তো পারতো ?

লিলি—তবে কি পুলিশের প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে তাকে উত্তেজিত করলে ?

হালদার—এমনই বা কি ইঙ্গিত? জ্ঞানের এখানে আসা যাওয়া সত্যিই যদি অশোভন না হয়, তা হলে প্রশ্নের ইঙ্গিতই বা অশোভন হবে কেন?

লিলি—তবে কি রামেন্দুর প্রেপ্তারেই ওর মন ঠিক নেই?

হালদার—একজন অতিথির উপর অসৌজন্য দেখাবার তাও সঙ্গত কারণ হতে পারে না।

লিলি—কী তবে কারণটা?

হালদার—জানিনা। কিন্তু একটা কথা তোদের আমি ক'দিন থেকেই বলব ভাবি, বলতে মনে থাকে না। জ্ঞানেন্দ্র এখানে আসছে, কনকের সঙ্গে মাখামাখিও বাড়ছে, তবু আমি ভয় পাইনি।

[লিলি নিরুত্তরে শুনে যেতে লাগলো।

হালদার—আমার কেমন একটা সন্দেহ আছে, প্রথম যৌবনে মানুষের মনে প্রেমের কামনা জাগে, কিন্তু প্রেম জাগে না। হৃদয় নিয়ে ক'দিন ধরে তারা ছেলেখেলা করে মাত্র।

লিলি – কি রকম?

হালদার—বড় প্রেমের জন্ম হয় বড় বেদনা থেকে। প্রেম চপল হৃদয়ের ভাপে ফোটানো বাষ্প নয়। তা অশ্রুর মত, শিশিরের মত টুল্‌টুলে।

লিলি—[খিলখিল করে হেসে] বলে যান। আমি টুলটুলে প্রেমও দেখিনি, বায়বীয় প্রেমও দেখিনি। প্রেমের যে এত রকম ফের আছে তাও জানতাম না।

হালদার - [শান্ত সমাহিত কণ্ঠে] সবই জানবি দিদি। সেই প্রার্থনাই করি। জীবনে যারা ভালোবাসার দুঃখ পেলেনা, তাদের চেয়ে দুঃখী আর নেই।

লিলি—আপনি জেনেছেন ?

হালদার—না জানলে আর এত কথা বলছি কি করে ? সিঁড়ির পথে যেতে-আসতে চুপি চুপি দুটো কথা, এঘর থেকে ওঘর যেতে হাতে গুঁজে দেওয়া চিঠি, প্রণয়ীর মুখের ওপর আঁচলের ঝাপটা দিয়ে চলে যাওয়া,—কত কী তো দেখলাম !

লিলি—মিথ্যে কথা ! কখনো দেখেননি।

হালদার—না দেখলে বলছি কি করে ?

লিলি—বানিয়ে বলছেন। নয়তো কনকের দেখেছেন। আমার ...আমি...

হালদার—[এক চোখ বুঁজে] দুজনেরই দেখেছি বন্ধু ! সত্যি কথা কি বানিয়ে বলা যায় ? সবই দেখেছি। তখনই বুঝেছি, এ প্রেম নয়, প্রেমের বাষ্প। উবে যেতে দেরী হবে না।

লিলি—[ক্রুদ্ধভাবে] আপনি তো সবই বুঝেছেন !

হালদার—জ্ঞানেন্দ্র এলেন, বিশ্বমোহন গেলেন। রামেন্দুর বরাত ভালো। তার প্রেমে এখনও প্রতিদ্বন্দ্বী জোটেনি। তবুও জুটতে কতক্ষণ ? কি বলিস ?

লিলি—কিছুই বলা যায় না। আপনি নিজেই তো রয়েছেন !

হালদার—এই দেখ, আমি নিজেই তো রয়েছি !

[উভয়ের হাস্য ।

হালদার—তা হলে সত্যি কথা বলি শোন। তোকে যে আমি এত ভালোবাসি, সে শুধু তুই রামেন্দুকে ভালবাসিস বলে নয়।

লিলি—তবে?

হালদার—তোর হাসিতে, কথায়, বেণী দুলিয়ে চলবার ভঙ্গিতে আমার পুরোনো স্মৃতি জেগে ওঠে।

লিলি—সর্বনাশ! তারপর কি হয়?

হালদার—আর কিছুই হয় না। শুধু মনে একটু দোলা লাগে।

লিলি—[টিপে টিপে হাসতে লাগলো] আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, আপনার নেপালের সেই প্রিয়ার সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ আছে? হয় তো আমার ঠাকমাই...

হালদার—কি রকম?

লিলি—বলা তো যায় না। আমার ঠাকমার ছবি আপনি দেখেছেন। কে জানে তিনি সেই কিনা?

হালদার—সে কি সম্ভব?

লিলি—অসম্ভব কি? নামে মিলছে, চেহারায় মিলছে। তা ছাড়া শুনেছি, নেপালে তাঁরও একজন আত্মীয় থাকতেন। ছেলেবেলায় সেখানে তিনি যেতেনও ঘন ঘন।

[হালদার সাহেব অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলেন। এমন সময় বাইরে মোটরের হর্ন বাজলো। একটু পরেই কনকের কাঁধের ওপর ভর দিয়ে শৈলবিহারী প্রবেশ করলেন। তাঁর মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। চোখের দৃষ্টি আতঙ্কগ্রস্তের মত বিহ্বল।

হালদার—তোমার কি অসুখ করেছিল, শৈল ?

শৈল—না।

হালদার - তোমার চেহারা ওরকম হ'ল কেন ?

[শৈলবিহারী উত্তর দিলেন না। কনকের কাঁধের ওপর হাত দিয়ে ওপরে চলে গেলেন। সুরুচি এলেন। মোট, পোঁটলা আসতে লাগলো। একটা বিছানা, দুটো সুটকেস্‌, জলের কুঁজো, গ্লাস, এমনি টুকিটাকি নিতান্ত অপরিহার্য কতকগুলো জিনিষ। ওদের সামনে দিয়ে চাকরে সেগুলো একটা একটা করে নিয়ে যেতে লাগল। সুরুচি হালদার সাহেবকে প্রণাম করলেন। তাঁকে দেখে হালদার সাহেব যেন অন্ধকারে আলো পেলেন এমনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

হালদার—তুমি এসেছ ছোটমা! আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম, যে! অথচ তোমারই কথা মনে পড়ছিল না। বস, বস। শৈলর কী হয়েছে ? ও অমন ভেঙে গেল কেন ?

সুরুচি—কি জানি বাবা। যেদিন আমাদের বাড়ী খানাতল্লাস হ'ল, অনেক লাঠিধারী পুলিশ, রিভলভারধারী সার্জেন্ট, দারোগা, পুলিশের বড় সাহেব, অনেক লোকের ভারী বুটের শব্দ, এই সব শুনে কেমন যেন উনি ভড়কে গেলেন। তারপর দিন সকালে ওঁকে থানায় নিয়ে গেল। বিকেলে ফিরে এলেন যেন কি রকম হয়ে। তারপর দেখতে দেখতে ওই রকম হয়ে গেলেন।

হালদার—Nervous breakdown !

সুরুচি—ওখানকার ডাক্তারে বললে, ভয় পেয়ে ওরকম হয়েছে, কি হবে বাবা ?

[সুরুচি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন

হালদার—[উত্তেজিত ভাবে] কী হবে ? কী হতে পারে ? বিংশ শতাব্দী নিয়ে এসেছে এই অভিশাপ। পৃথিবী জুড়ে সর্বত্র উঠেছে মানুষের হাহাকার। যাদের আছে আর যাদের নেই, সবাই সমান ত্রস্ত। সমৃদ্ধিতে পর্যন্ত সুখ নেই। অত্যন্ত পুরোন হয়ে গেছে এই পৃথিবী। এর বিধি বিধান, সমাজ শৃঙ্খলার বাঁধন গেছে পচে। এর বদ্ধ হাওয়ায় আর নিশ্বাস নেওয়া যায় না। নতুন করে একে ঢেলে সাজতে হবে। তা ছাড়া কিছু করবার নেই।

সুরুচি—সে তো অনেক বড় কথা বাবা !

হালদার—বড় কথাই তো ছোটমা। অনেক বড় কথা। সেই অনেক বড় কথাকে এত ছোট করতে গিয়েই তো বিপদ ঘটেছে। তোমার স্বামীর নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে ডাক্তারী শাস্ত্রে তার হয়তো একটা সারবার ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা করাও হবে। কিন্তু তাতে রোগটার চিকিৎসাই হবে ছোটমা, মানুষটার নয়। কালকে ওকে আর থানায় ধরে নিয়ে যেতে হবে না, রাস্তার মোড়ে একটা লাল পাগড়ী দেখলে হয়তো এমনি ভেঙে পড়বে। তার কি করবে ? ঢেলে সাজতে হবে ছোটমা, সব নতুন ক'রে ঢেলে সাজতে হবে। বুঝলে ?

সুরুচি—আপনাদের পেয়ে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম বাবা। বলবো কি, ওঁকে নিয়ে আমার এমন হয়েছে যে একদণ্ড সেই ছেলেটার কথা পর্যন্ত ভাবতে সময় পাইনা। সে যে কোথায় আছে, কেমন আছে তাই বা কে জানে?

[চাকরের প্রবেশ।

চাকর—আপনার স্নানের জল দেওয়া হয়েছে মা!

সুরুচি—দিদিমণি কোথায়?

চাকর—বাবুর কাছে।

হালদার—তুমি ওঠ মা, একে ট্রেনের ধকল, তাতে সারারাত্রি জাগরণ—স্নান সেরে একটু বিশ্রাম কর গে। ভয় কি? এখানে যখন এসেছ তখন সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা যা তাই হবে! ওঠ! আমি এখনই টেলিফোন করে ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি।

[সুরুচি চোখ মুছতে মুছতে ওপরে উঠে গেলেন। হালদার সাহেব টেলিফোনের রিসিভারটা ধরলেন।

হালদার—Hallo. P. K. 73. Yes please. Hallo. Dr. Gupta? আমি মিঃ হালদার কথা বলছি। হ্যাঁ, পাম এভিনিউ, আমার ছেলে এসেছে, অসুস্থ···বোধ হয় নার্ভাস ব্রেকডাউন। একবার আসবেন? যে কোন সময়।···এখনই আসছেন?···Thank you.

[রিসিভার নামিয়ে দিলেন। এমন সময় দ্বার-প্রান্তে একটা মাথা দেখা গেল।

লিলি—[তার কাছে এসে] কি চাও ?

[লোকটা তার হাতে এক টুকরো কাগজ দিলে।

লিলি—[চিঠি পড়তে পড়তে] কি এ !

লোকটা—[বাঁ হাত দিয়ে ট্রাম রাস্তার মোড়টা দেখিয়ে] সায়েব দিলে।

লিলি—তুমি কে ?

লোকটা—রিকসাওয়ালা, গাছের ছাওয়ায় গাড়ী নামিয়ে বসে ছিলাম, সায়েব এসে বললে, এইখানা ওই আটত্রিশ নম্বর বাড়ীতে দিয়ে আয়, তোকে আট আনা পয়সা বকশিস দেব।

[আধুলিটা ট্যাঁকে গুঁজলো।

লিলি—যাও।

[চিঠিখানা হালদার সাহেবকে দিলে।

হালদার—[চিঠি পড়তে পড়তে] "মোড়ের মাথায় পানওয়ালা সম্ভবতঃ informer. নানা ধরণের লোক তার কাছে এসে ফিসফাস করে। সাবধানে থাকবেন।" তাই তো। শেষে কি তোদের পিছনেও···কিন্তু চিঠিখানা লিখছে কে ? লেখাটা কার ?

লিলি—[মুচকি হেসে] জ্ঞানদা'র।

হালদার—[সহাস্যে] ও, তা হলে বোঝা যাচ্ছে তিনিও এই দিকেই ঘোরাঘুরি করছেন। আর দেরী করা ভালো নয় ভাই। এখনই গিয়ে ওকে নিয়ে আসি চল্। কতদিন আর হ্যাংলার মত বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরবে !

লিলি—কি দরকার দাদু ? আমার সম্পর্কে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এ বাড়ীতে সে এসেছিল। এখন যদি বিদায় নিয়েই গিয়ে থাকে, আবার মিছে কেন তাকে আমা'দর ভাগ্যের সঙ্গে জড়ানো ?

হালদার— নিরুত্তর। ।

লিলি—কনক শক্ত হয়েছে। জ্ঞান্‌দাও হয় তো কয়েকদিন ঘোরাঘুরির পরে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। বাকী আমরা। আমাদেরও বোধ হয় একটু শক্ত হওয়া উচিত।

হালদার—কিন্তু আমি তোমাদের এখানে কেন নিয়ে এসেছি বলেছি তো।

লিলি—ত' যেন বলেছেন। কিন্তু সমাজকে তো আপনি ধমক দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারবেন না ?

হালদার—আমি কাউকে ধমক দিতে চাই না লিলি। সমাজকেও উড়িয়ে দিতে চাই না। আমি শুধু চাই, অভিশপ্ত শতাব্দীর মাঝখানে ছোট্ট একটুখানি স্বর্গ রচনা করবার অবকাশ। যেখানে ভগবানের নাম নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠবে না, শান্তির নাম করে মানুষে মানুষে যুদ্ধ বাধবে না ; স্বার্থ বুদ্ধি এসে কল্যাণের পথ রোধ করবে না। সমাজের কথা বলছ ? সমাজও থাকবে. কিন্তু পাহাড়ের মত অনন্তকাল ধরে একই জায়গায় থাকবে কেন ? তাকে আরও প্রশস্ত, আরও উদার করতে হবে।

লিলি—কিন্তু আমরা যে খৃষ্টান !

হালদার—সে শুধু ধর্মে, নইলে আর সব দিক দিয়ে তোমরা আমাদেরই। ধর্ম ছাড়া আর তোমরা কী ত্যাগ করেছ বলতো ?

লিলি—[হেসে ফেলে] কিছুই না। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন দাদুভাই, আমরা ব্রাহ্মণ ছিলাম, খৃষ্টান হয়েও ব্রাহ্মণ খৃষ্টান ছাড়া আর কারও সঙ্গে আমাদের কেউ কখনও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি।

হালদার—[সবিস্ময়ে] বলিস্ কি ? হিন্দুত্ব ছেড়েছিস কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব ছাড়তে পারিসনি ?

লিলি—এখনো তো পারিনি।

হালদার—আশ্চর্য !

[ডাক্তারের প্রবেশ।

ডাক্তার—Good morning Mr. Halder !

হালদার—Good morning Doctor.

[কনক ওপর থেকে নেমে আসছিল।

হালদার—কনক ! ডাক্তার বাবুকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাও।

কনক—আসুন।

[ডাক্তার বাবুকে নিয়ে কনক চলে গেল।

হালদার—তা হলে জ্ঞানের সম্বন্ধে কি কর' যায় বল ?

লিলি—আমি কি বলবো ?

হালদার—তুমি কিছু বলবে না, কনক কিছু বলবে না, আমিও কিছু

বলব না। তা হলে ও বেচারা অমনি আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াবে? বাঃ বেশ তো!

লিলি—কিন্তু কাকাবাবু, কাকীমা কি ওর এবাড়ীতে আসা যাওয়া তেমন পছন্দ করবেন?

হালদার—কাকীমার কথা জানিনা, কিন্তু কাকাবাবু পছন্দ করবেন না, সুনিশ্চিত।

লিলি—তা হলে?

হালদার—[একটু চিন্তা করে] তা হলে থাক। এমনিতেই শৈলর নার্ভের অবস্থা ভালো নয়। এ ব্যাপারে হয়তো আরও খারাপ হয়ে যাবে।

[দু'জনে চিন্তিত ভাবে বসে রইলেন। ওপর থেকে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে কনক নীচে নেমে এল।

ডাক্তার—ঠিকই বলেছেন, nervous breakdown. কারও সঙ্গে কথা বলেন না। কেউ এলে বিরক্ত হন। একটু শব্দে চমকে ওঠেন। আমি prescription করে গেলাম। সেইটা খাওয়াবেন। আর কেমন থাকেন আমাকে সংবাদ দেবেন। আর একটা কথা, ওঁকে ঐ ঘরের মধ্যে চুপ করে বসিয়ে রাখবেন না। নির্জ্জন গৃহকোণে একা বসে থাকাটা ভাল নয়। সকাল বিকালে বেড়াতে দেবেন। আচ্ছা।

হালদার—ভয় নেই তো?

ডাক্তার—নাঃ। তবে সময় নেবে। অন্ততঃ ছ'টা মাস ওঁর পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। আচ্ছা।

[হালদার সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করে প্রস্থান।

কনক—সেইটেই মুস্কিল। উনি কিছুতেই আরও ছুটি নিতে রাজী হচ্ছেন না। বলছেন তাহলে চাকরী যাবে।

হালদার—[উত্তেজিত ভাবে] থাকগে চাকরী। কি হবে চাকরী, যখন আমার এতগুলো টাকা ব্যাঙ্কে আছে ?

কনক—তাও বলছি। তবু কেবলই বলছেন, উঁহু বুঝিস না। যা চাকরীর বাজার। বেশি বলতে গেলে বিরক্ত হচ্ছেন। ডাক্তার আনাতেই রাগ কত !

হালদার—কেন ?

কনক—বলছেন, ডাক্তারে কি করবে ? উনি এখনই কালীঘাটে পূজো দিতে যাবেন। গাড়ীটা বের করতে বলি।

হালদার—আর কে যাচ্ছেন ?

কনক—আমি যাচ্ছি, মাও যাচ্ছেন।

হালদার—একটা চাকরও সঙ্গে নিয়ে যাবি।

কনক আমি গাড়ীটা বের করতে বলে আসি।

[প্রস্থান। তখনই ফিরে এসে উপরে চলে গেলো।

হালদার তবে এখন একটা কাজ করা যায়।

লিলি—কি কাজ ?

হালদার—আমরা তো জ্ঞানের বাড়ী যেতে পারি। তাকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলতে পারি।

লিলি—তা পারি। তাই চলুন বরং। কনককেও জানিয়ে কাজ নেই। এখনই ও কাকাবাবুদের নিয়ে মোটরে বার হলে

আমরা জ্ঞানদা'র ওখানে যাব। দূরে তো নয় একটা ট্যাক্সি করে গেলেই চলবে। তবে…

হালদার—[সাগ্রহে] কি তবে ?

লিলি—[মুচকি হেসে] দেখা পেলে হয়।

হালদার—কেন ?

লিলি—সে না তখন এই পাড়াতেই ঘোরাঘুরি করতে থাকে।

[দুজনেই হেসে উঠলেন। সেই সময় কনকের কাঁধে ভর দিয়ে শৈলবিহারী নেমে আসছিলেন।

হালদার—খুব সাবধানে নিয়ে যাবে।

[ওরা কেউ কোনো জবাব দিলে না। ধীরে ধীরে চলে গেলো।

হালদার—যা বলেছিস! আমার নিজেরও সন্দেহ হয় জ্ঞান ঘরে থাকতে পারছে না এই দিকেই ঘোরাঘুরি করছে। কে জানে, হয়ত এখন সে এই পাড়াতেই‥ [সোৎসাহে] এই যে জ্ঞান! এস এস।

[জ্ঞান ভিতরে এসে কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার পরিধানে এখন খদ্দরের পোষাক।

জ্ঞান—অন্য কিছু নয়। আমি শুধু লিলিকে একটা কথা বলতে এসেছি। সে তো আমার আত্মীয়া। ওর সঙ্গে দেখা করতে তে আমার দোষ নেই।

হালদার—নিশ্চয়ই নেই। তা ছাড়া এটা ঘর নয়, বারান্দা।

চৌকাঠটা ওদিকে। সেটা না পার হলে তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে। আমি বলি, তুমি বরং এইখানে বস।

[হালদার সাহেব তাকে জোর করে ধরে নিজের পাশের চেয়ারটায় বসালেন।

জ্ঞান—[কোনো দিকে না চেয়ে] এখান থেকে বাড়ী ফিরে দেখি তোমার বাবার একখানা চিঠি এসেছে লিলি। পূজার ছুটি আসছে, অথচ তুমি বাড়ী যাওয়ার কোনো কথাই তাঁদের লেখনি। তুমি বোধ হয় অনেক দিন তাঁদের চিঠিই দাওনি। তাঁরা খুব উদ্বিগ্ন হয়েছেন। কি ব্যাপার আমাকে সব জানাতে লিখেছেন।

লিলি—আমি

হালদার—[হাত বাড়িয়ে ওকে বুকে টেনে নিয়ে] ও আর বাড়ী যাবে না ভাই। ওর বাবাকে লিখে দাও, 'ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কলঙ্ক সাগরে।'

জ্ঞান—[হেসে] কোথায় ডুবলো ?

হালদার—সেইটাই আশ্চর্য দাদা। সাগর মহাসাগর পার হয়ে এসে কলঙ্কিনী ডুবলো কিনা আমার এই গোষ্পদ জলে !

[হালদার ও জ্ঞানেন্দ্রের হাস্য।

লিলি—[ভ্রূভঙ্গে] আহা !

হালদার—নিশ্চয়।

জ্ঞানেন্দ্র—[জড়িত কণ্ঠে] আমি বলছিলাম……ইয়ে……

হালদার—মানে কনক কোথায়, এইতো ?

জ্ঞান—না স্যার। তিনি বাইরে গেছেন। আমি দেখেছি। মানে......

হালদার—মানে ?

জ্ঞান—মানে খৃষ্টানের সঙ্গে হিন্দুর বিবাহ কি অসম্ভব ? অর্থাৎ আমাদের মত খৃষ্টানের সঙ্গে, যারা ধর্ম দিয়েছে কিন্তু জাত এখনও দেয়নি ?

হালদার—তোমাদের কথা আমি শুনেছি। ধর্মান্তর গ্রহণ করেও তোমরা অত্যন্ত যত্নে ব্রাহ্মণ রক্তের বিশুদ্ধি রক্ষা করে আসছ। তবু আমার আশঙ্কা আছে, সমাজ কিছুতেই এ বিবাহ মেনে নেবেনা।

জ্ঞান—আশ্চর্য !

হালদার—আশ্চর্য কিছুই নয় ভাই। এমনিই হয়। কোনো সমাজই অত্যন্ত সহজে এবং নিঃশব্দে কোনো কিছু মেনে নেয় না। তাকে মানিয়ে নিতে হয়।

জ্ঞান—কি ক'রে ?

হালদার—তাকে না মেনে, অথচ তাকে ত্যাগ না করে। আমাদের কালে বিলেত যাওয়া সমাজে নিষিদ্ধ ছিল। তারপর যখন দলে দলে লোক সেই নিষেধ অমান্য করে বিলেত যেতে লাগলো, অথচ সমাজও ছাড়লো না, তখন বাধ্য হয়ে সমাজকে তা ধীরে ধীরে মেনে নিতে হল। তোমরা একে যতটা অচল ভাব, ততটা অচল নয়। বহুকাল পরে বাঙলা দেশে ফিরে এসে সেইটে সব প্রথম আমার চোখে পড়েছে।

আমি দেখেছি বাইরে থেকে আঘাত দিয়ে কেউ এর দরজা খোলা পায়নি। কিন্তু ভিতর থেকে যখনই আঘাত পড়েছে, তখনই দরজা খুলেছে। কখনও দেরী হয়েছে, কখনও হয়নি।

জ্ঞান—আপনি অদ্ভুত, আপনি আশ্চর্য দাদু!

[জ্ঞানেন্দ্র নত হয়ে প্রণাম করলে

৬

হালদার সাহেবের শয়ন কক্ষ। একটা বড় শোফায় তিনি অর্ধশায়িত। পা'টা রাগে ঢাকা। বুকের উপর একখানা খোলা বই। নিঃশব্দে কি যেন ভাবছিলেন। দরজা ঠেলে ভিতরে এসে লিলি তাঁর পা তলায় একটা টুলে বসলো।

হালদার—বস! কনকের খবর কি?

লিলি—ভালো নয়।

হালদার—কেন?

লিলি—তাই মনে হয়। গল্প করে না, হাসে না, কথা পর্যন্ত বলে না। কাকীমা এসে পর্যন্ত সমস্ত ক্ষণ রান্নাঘরে। কনক সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে দিন রাত্রি কাকাবাবুর কাছে কাছে আছে। তাঁকে খবরের কাগজ, বই পড়ে শোনায়, তাঁকে নিয়ে বিকেলে গাড়ি করে বেড়াতে যায়। কিন্তু আপনার কি মনে হয় না, এর সমস্তটাই পিতৃভক্তি নয়, এর মধ্যে নিজেকে দুঃখ দেবার মস্ত বড় চেষ্টা রয়েছে?

হালদার—তুই সেটা ধরতে পেরেছিস?

লিলি—এ ধরা আর এমন কী কঠিন!

হালদার—[একটু চুপ করে থেকে] আমার বন্দুকটা বের করিস তো আজকে।

লিলি—বন্দুক কি হবে?

হালদার—শিকারে যাব। এখানে কাছাকাছি কোথাও শিকারের সুবিধা নেই ?

লিলি—কেন থাকবে না ? কালকেই আমি মার্কেট থেকে এক গাদা পাখী কিনে এনে ঐখানে ঝুলিয়ে রাখবো। আপনি এইখানে বসে শিকার করবেন। আমি চা করে আনবো, ক্লান্ত হলে খাবেন। কেমন ?

হালদার—উত্তম প্রস্তাব। বোঝা গেল শিকারের সম্বন্ধে তোমার কোন আগ্রহই নেই। তা হলে আর কি করা যেতে পার বল ? তোমার তো বাড়ী যাবার আগ্রহ দেখছি না।

লিলি—তাতে আপনার অসুবিধাটা কি হ'ল ?

হালদার—কিছুই না। ভাবছি তুই আবার আমার প্রেমে পড়ে গেলি না তো ?

লিলি—[হেসে] বলা যায় কি ?

হালদার—সারলে। শেষ পর্যন্ত পুনর্জন্ম বিশ্বাস করতে হবে না কি ?

লিলি—সে আর নূতন কথা কি ! আপনি তো বিশ্বাস করেই থাকেন।

হালদার—কখ্খনো না। এই সবে তোর পাল্লায় পড়ে একটু একটু করে বিশ্বাস হচ্ছে।

লিলি—তা হলেই হ'ল।

[গম্ভীর মুখে কনকের প্রবেশ]

কনক—মিঃ মুকার্জী অ্যারেষ্টেড।

হালদার } জ্ঞানেন্দ্র !
লিলি } জ্ঞানদা, ।

কনক—[ঘাড় নেড়ে সায় দিলে]

হালদার ও
লিলি (Arrested ।

কনক—[আবার ঘাড় নেড়ে সায় দিলে]

হালদার—কি করেছে সে ?

কনক—কি করে জানবো ? অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার হয়েছেন ।

লিলি—তুমি জানলে কেমন ক'রে ?

কনক—ওদের বাড়ীর চাকর খবর দিয়ে গেল ।

[হালদার ও লিলি নিঃশব্দে বসে রইলেন]

কনক—ঠিকই হয়েছে ।

লিলি—কি করে ? সে যে নিরপরাধ সে তো আমরা সবাই জানি ।

কনক—তোমরা জানলে তো হবে না । যাদের জানবার কথা তাদের জানা চাই ।

লিলি—তারা এত খবর জানে, এইটে জানে না ?

কনক—না ।

[কনক চলে গেল কিন্তু তখনই আবার ফিরে এল ।

কনক—সেদিন তিনি আমার ওপর রাগ করে চলে গেলেন । কিন্তু এখন বোধ হয় বুঝছেন কেন তাঁর ওপর এত কঠোর হয়েছিলাম ।

হালদার—কিন্তু তাতেও তো শেষ রক্ষা হল না দিদি !

কনক—(অন্যমনস্কভাবে) কি জানি কোথায় শেষ, কেমন করেই বা রক্ষা হবে।

[মস্ত বড় একটা ফর্দ হাতে শৈলবিহারী টলতে টলতে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সমস্ত শরীর সকল সময় কাঁপে। সকলে ব্যস্ত হয়ে দাঁড়াল।

কনক—[ব্যস্ত হয়ে তাঁর দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল] আপনি নিজে কেন এলেন বাবা? আমাকে ডাকলেই তো আমি যেতাম।

[শৈলবিহারী বসলেন না।

শৈল—কলকাতা ভাল লাগছে না।

কনক—আজ সকালে দাদার চিঠি এসেছে বাবা! লিখেছে, ভাল আছে।

শৈল—পুরী যাব। জিনিষ পত্রের একটা ফর্দ করলাম। একটা টাইম টেবল কিনে আনো, আর এই জিনিষ গুলো কিনতে হবে।

কনক—বেশ তো বাবা, আজ বিকেলেই কিনে নিয়ে আসব।

শৈল—[ক্রুদ্ধ ভাবে] বিকেলে নয়, এখনই।

কনক—আচ্ছা বাবা।

শৈল—হুঁ।

[শৈলবিহারী ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। কনক ওঁর সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর গিয়ে ফিরে এল। তিনজনে নিঃশব্দে বসে রইলেন।

কনক—আমার কেবলই ভয় হচ্ছে দাদু, এই অভিশপ্ত শতাব্দীর বুকে একটুখানি স্বর্গ রচনার যে কল্পনা নিয়ে এখানে এসেছেন, তা হয়ত কল্পনাই রয়ে যাবে।

হালদার—কেন ?

কনক—ঠিক জানি না। কিন্তু কেমন যেন মনে হয়, শতাব্দীর অভিশাপ আমাদের রক্তকে পর্যন্ত বিষাক্ত করে তুলেছে। এর থেকে আমাদের বুঝি পরিত্রাণ নেই। এখানে নিশ্চিন্তে নীড় বাঁধা অসম্ভব।

হালদার—(বিহ্বল কণ্ঠে) আমার সমস্ত স্বপ্ন কি তবে মিছে হবে ? এই পৃথিবীর যে রূপ আমি কল্পনায় দেখেছি,—উন্নত উদার পুরুষ, রূপময়ী নারী, বলিষ্ঠ সুন্দর শিশু, সহৃদয় সমাজ, সমদর্শী রাষ্ট্র, সেই হাস্যময়ী রূপে এই পৃথিবী কি কোনো দিন জাগবে না ?

[বেদনায় তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। লিলি তাড়াতাড়ি এসে ওঁর কম্পিত লোল একখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিলে।

লিলি—কে বললে জাগবে না দাদু ? আপনার মতো যাঁরা সত্যিই বড়, যাঁদের নিষ্ঠা আছে কিন্তু সংস্কার নেই, যাঁরা ভালবেসে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, তাঁদের সাধনা কিছুতেই মিথ্যা হবে না। কত ঘর ভাঙবে কত প্রিয়জন হারিয়ে যাবে। কত অঘটন ঘটবে, কিন্তু সেই সাধনা সমস্ত ভাঙাগড়াকে উপেক্ষা করেও থাকবে। তার মৃত্যু নেই।

হালদার—ঠিক জানিস মৃত্যু নেই ?

লিলি—মৃত্যু নেই। তাইতো নির্দোষ হয়েও জ্ঞানদা' নিঃশব্দে চলে গেল।

হালদার—সে কি সমস্তই জেনে গেছে তাহলে ?

লিলি—জেনেই তো গেছে। আপনাকে যে ভালোবাসতে পেরেছে তার কি কিছু জানতে বাকি আছে নাকি ?

হালদার—[অন্যমনস্ক ভাবে] জেনেও গেছে !

[হালদার সাহেব নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তাঁর ঘাড় ঝুলে পড়ল।

হালদার—[অস্ফুট স্বরে] ঠিক জানিস ?

লিলি—ঠিক জানি দাদু ! ওতো জানতো, ওর বাইরে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। তবু নির্দোষ হয়েও যে কারও বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করলে না, সে তো শুধু এই বিশ্বাসের জোরে যে, নতুন পৃথিবীর জন্ম আসন্ন। আমার নিজের মনে হয়, সেদিন যে ও এখানে এসেছিল, সে আর কিছুর জন্যে নয়, বার বার করে শুধু আপনার পায়ের ধুলো নেবার জন্যে।

হালদার—[ক্রুদ্ধভাবে] নির্দোষ হয়েও বেচারা অনেক কষ্টই পাবে।

লিলি—পাওয়া যে চাই দাদুভাই। জেলের ভিতরে, জেলের বাইরে, রণক্ষেত্রে, গৃহকোণে সমস্ত জায়গায় মানুষ ক্রমাগত দুঃখ পাবে, তবে তো পৃথিবীকে চিনবে, তবে তো আপনাদের সাধনা সম্পূর্ণ হবে।

হালদার—তবে তো মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে। ঠিক বলেছিস। দুঃখ পাওয়ার প্রয়োজন আছে। আচ্ছা, তোর কি মনে হয়, আমার পৃথিবীর যে রূপ আমি কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেছি, তা বাইরের এই চোখ দুটো দিয়ে দেখে যেতে পারবো ?

লিলি—সে তো কেউ কোনোদিন দেখে যেতে পারবে না দাদু ভাই।

হালদার—তবে ? তবে কি করে তা সম্ভব হবে ?

লিলি—সত্যি বলেই সম্ভব হবে দাদু। তা কেউ কোনদিন চোখে দেখবে না। তবু চিরকাল ধরে তাই পৃথিবীর একমাত্র সত্য রূপ হয়ে থাকবে।

[হালদার সাহেব দূরের দিকে চেয়ে তদ্গত চিত্তে কি যেন দেখতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত মুখ একটা অপরূপ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

হালদার—[অত্যন্ত চুপি চুপি] আমার সেই স্বপ্নের পৃথিবী জন্ম নিচ্ছে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জানিস্ ?

[ওরা অবাক হয়ে ওঁর উজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে রইলো। ঠিক সেই সময় কাদের যেন ভারী বুটের শব্দ সিঁড়ির ওপর পাওয়া গেল। কনক সচকিত হয়ে দরজার কাছে আসতেই পুলিসের সঙ্গে মুখোমুখি। লোকটা ভারী গলায় কি একটা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল।

কনক—[ঠোঁটের ওপর তর্জনী তুলে] Sh ! Don't shout. Come this way please.

[পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে ওরা সিঁড়ি দিয়ে নীচের বারান্দার ঘর খানিতে এল।

কনক– এইবার বলুন আমরা আপনার কি করতে পারি ?

পুলিশ—(উপরে ইঙ্গিত করে) উনি কি অসুস্থ ?

লিলি–[অসহিষ্ণু ভাবে] না। আপনার কি দরকার তাই বলুন।

পুলিশ—আপনার নাম কি ?

লিলি—লিলি সরকার।

পুলিশ—[কনককে] আপনার ?

কনক—কনক হালদার।

পুলিশ—আপনাদের আমরা সম্রাটের নামে গ্রেপ্তার করলাম। এই দেখুন ওয়ারেণ্ট।

[কনক ও লিলি ওয়ারেণ্ট হ'তে নিয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে হাসলো।

হালদার—[নেপথ্যে] কনক, লিলি !

কনক ও লিলি—যাই দাদু।

[ওরা যেতে উদ্যত হতেই পুলিশ বাধা দিলে। চারিদিক থেকে আরও অনেক পুলিশের বুটের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। অন্যমনস্ক ভাবে হালদার সাহেব তাঁর বর্মা চুরুটটি মুখে নিয়ে নেমে আসছিলেন। সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে পুলিশের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। মুখ থেকে ᐧার বর্মা চুরুট পড়ে গেল।

হালদার—ও ! [একটু হেসে] Good !

কনক—আপনাকে অনেক দুঃখ দিয়ে গেলাম দাদু। তাতে করে অনেক দিন মনে থাকবে আমাদের।

[হালদার মুখ নামিয়ে হাসলেন।

লিলি—স্বর্গ রচনা করতে ভুলবেন না দাদু !

[হালদার আর একবার হাসলেন। সুরুচি আস্তে আস্তে নেমে এসে হালদার সাহেবের পাশে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথার অবগুণ্ঠন খুলে গেছে। ওরা যখন চলে যেতে উদ্যত তখন একটা অব্যক্ত আর্তনাদে পিছন ফিরে দেখলে শৈলবিহারী টলতে টলতে এসে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়েছেন।

কনক—[দুহাতে চোখ চেপে] ওঃ !

লিলি—[অসহিষ্ণু ভাবে] আর দেরী কেন ? চলুন না কোথায় নিয়ে যাবেন। Good-bye দাদু।

যবনিকা

এই লেখকের

বন্ধনী, আকাশ ও মৃত্তিকা, বসন্ত রজনী, ঘরের ঠিকানা, ক্ষণবসন্ত, দেহযমুনা, মনের গহনে, ময়ুরাক্ষী, গৃহ-কপোতী, সোমলতা, শৃঙ্খল, শতাব্দীর অভিশাপ, শ্মশানঘাট, কৃষ্ণা, মধুচক্র, হংসবলাকা, পান্থনিবাস

ছেলেদের

ডাকাতের সর্দ্দার, হরেক রকম